ত সমুদ্দুর
র নদীর পারে



স্বপনবুড়ো



সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে

'৫৯

১৬২

াই টাকা

াতা—১২ হইতে প্রকাশিত

াস রোড কলিকাতা—৬

র নদীর পারে

হ

ক্র

অতিথ

পশ্চিম

আর

আ

নবুড়ো

যুগা

এত

আন্তর্জ

লোকে

হয়েছে

ভারতী

পেয়ে

অ

উ

অ

স

কোম্পানি ঃ কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : '৫৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৩৬২

Binding

দাম : আ ...াই টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলি...তা—১২ হইতে প্রকাশিত
ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস লিঃ, ১৫এ, ক্ষুদিরাম ...স রোড কলিকাতা—৬
হইতে মুদ্রিত।

দুটি কথা

জীবনে যে কোনো দিন ইউরোপ ভ্রমণে যাবো—'স্বপনবুড়ো' হয়েও এ স্বপ্ন আমার মনে কখনো জাগেনি! এ ব্যাপারে আমাকে ক্রমাগত তাগিদ দিতে থাকে কল্যানীয়া গীতা। তাঁর তাগিদে অতিষ্ঠ হয়েই আমি পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করি। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আর. গুপ্তের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই আমি পাসপোর্ট পাই। নইলে আমার রওনা হওয়াই হত না!

"সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে" যখন ধারাবাহিক ভাবে যুগান্তরে প্রকাশিত হতে থাকে তখন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে এত চিঠি আসে যে, তাতে আমি সত্যি অভিভূত হয়ে পড়ি! আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতি এবং এদেশ আর ও দেশের বহু লোকের সহযোগিতাতেই আমার ভ্রমণ নিরাপদ আর উপভোগ্য হয়েছে। তাঁদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ। ভিয়েনার রাজপথে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ফটোখানি শ্রীমতী শেফালী নন্দীর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁকেও জানাই প্রীতি।

আমার এই ভ্রমণে ব্যক্তিগত ভাবে আমি যা চোখে দেখেছি আর অনুভব করেছি তাই গল্পের মতো করে লিখে গেছি। কোথায়ও উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিনি। আমার এই রচনা পাঠ করে ভারতের তরুণ-তরুণীরা যদি দেশ-ভ্রমণে প্রেরণা লাভ করে তবেই এই লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পরিশেষে জানাই যে, আমার প্রকাশক অনুজ-প্রতিম শ্রীপ্রহ্লাদ-কুমার প্রামাণিক যে আন্তরিকতা নিয়ে পুস্তকখানি প্রকাশ করেছেন তাঁর সেই নিষ্ঠা আমার মনে অক্ষয় হয়ে রইল।

ইতি

বিনীত

মহালয়া

কলিকাতা, '৫৯

স্বপনবুড়ো

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার লেখা "সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে" বইখানি কিশোর-কিশোরীদের কাছে এত বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল যে, এক বছরের মধ্যেই এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নানা কারণে তাড়াতাড়ি ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। এজন্যে আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায়ই চিঠি পেতাম। চিঠিতে থাক্‌তো ছোটদের ক্রমাগত তাগিদ আর অনুযোগ। চিঠিগুলি পড়তে অবশ্য ভালই লাগ্‌ত। যাই হোক, দীর্ঘকাল পর বইখানি অবার আত্মপ্রকাশ করছে। আশাকরি যারা এ বইখানি এখনো পড়বার সুযোগ পায় নি বলে ক্রমাগত আমাকে মধুর পত্রাঘাত করেছে তারা এবার এর সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করবে না। ছোটদের আগ্রহেই আমি অধিকাংশ বই লিখেছি। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সবাইকার প্রীতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে রইল।

ছোটদের পাত্‌তাড়ি
যুগান্তর।

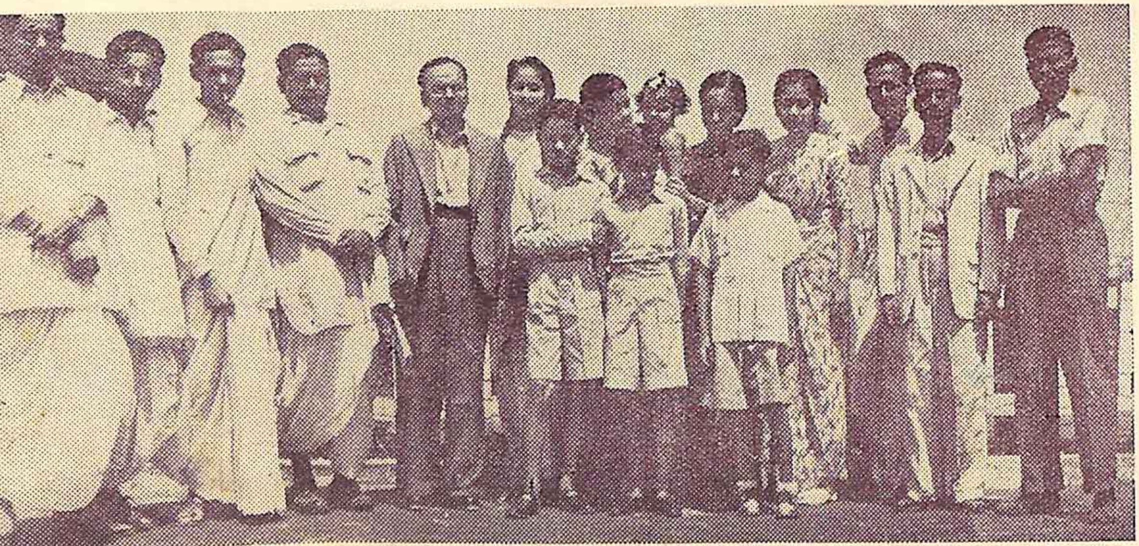
স্বপনবুড়ো

আমাদের দেশের ভ্রমণ-বিলাসী ছেলেমেয়েদের
হাতে দিলাম

শুভার্থী
স্বপনবুড়ো

মহালয়া
কলিকাতা, ১৩৫৯

দমদম বিমানঘাটিতে ইউরোপ যাত্রার ঠিক আগে





শীত করলে কম্বল দিয়ে দিব্যি ঢেকে দেবে বিমান-বালিকা



চিঠি লিখতে পারো বিমানে বসে একেবারে বিনি পয়সায়



কোন পথে আমরা উড়ে চলেছি তারই নক্সা



বিমান ওড়বার সময় কোমরে বেল্ট বাঁধতে হবে



ছোটরা দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে বিমানের মধ্যে



বিমান-বালিকা খাদ্য পরিবেশনে সত্যি তৎপর !



যাত্রিরা যে কোন সাময়িক-পত্রিকা পড়তে পারেন



ছোটদের জন্যে দুধের বোতলেরও ব্যবস্থা আছে বিমানে

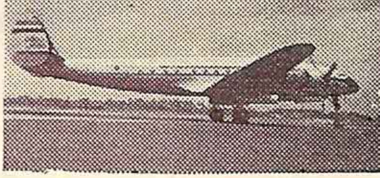


পা সটান করে শুয়ে থাকাটাই কি কম আরামের ?



দাড়ি কামাতে চাও ? —তারও পরিপাটি আয়োজন

ওড়বার
জন্যে
তৈরী
বিমান



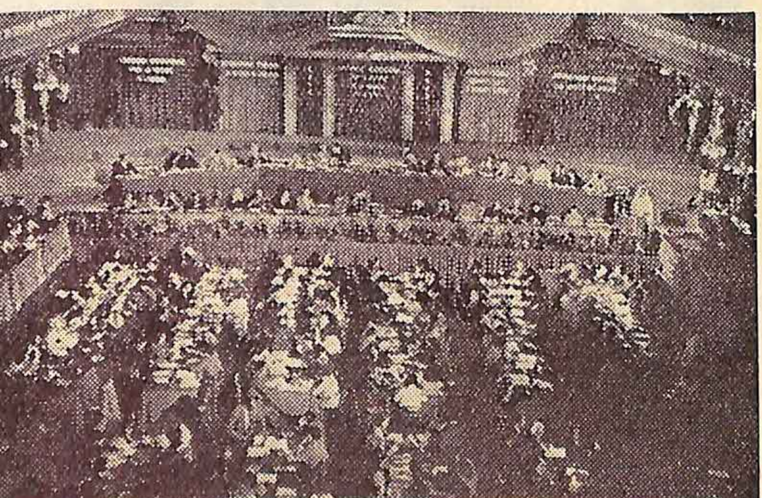
কে, এল, এম, বিমানের মধ্যে বিমান-বালিকা ছোটদের নানারকম পুতুল এনে খেলা দিয়ে থাকে

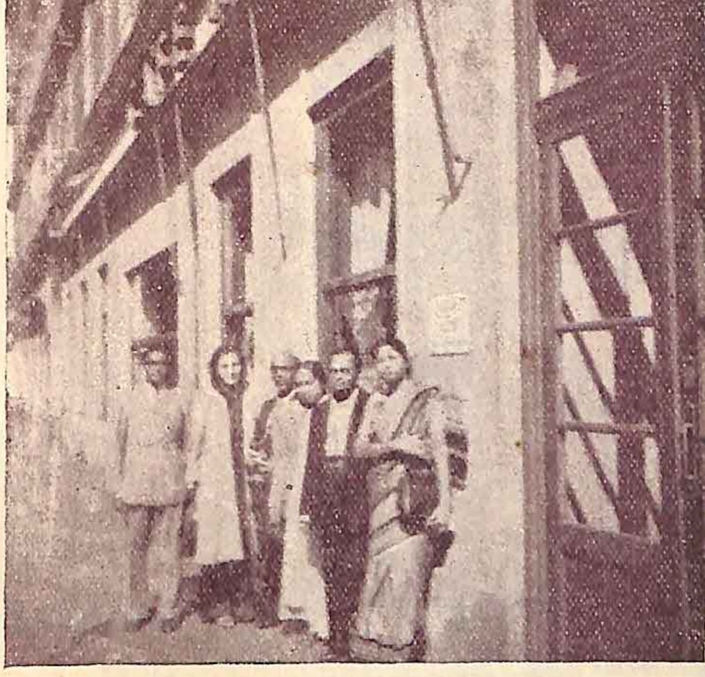




ভিয়েনার ছুটি মেয়ে রুথ ও ফেলিসিটাস। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদের কৌতুহলের শেষ নেই

ভিয়েনার এই সুবিখ্যাত মিউজিক হলে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল





ভিয়েনার রাজপথে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ।
ডাঃ সরকার, শ্রীমতী ওয়াদিয়া, ডাঃ চৌধুরী, শ্রীমতী মুখার্জী, স্বপনবুড়ো ও শ্রীমতী নন্দী

আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের প্রতীকরূপে এই চিত্রের অনুরূপ একটি বিরাট প্রাচীর চিত্র
ভিয়েনার মিউজিক হলে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল

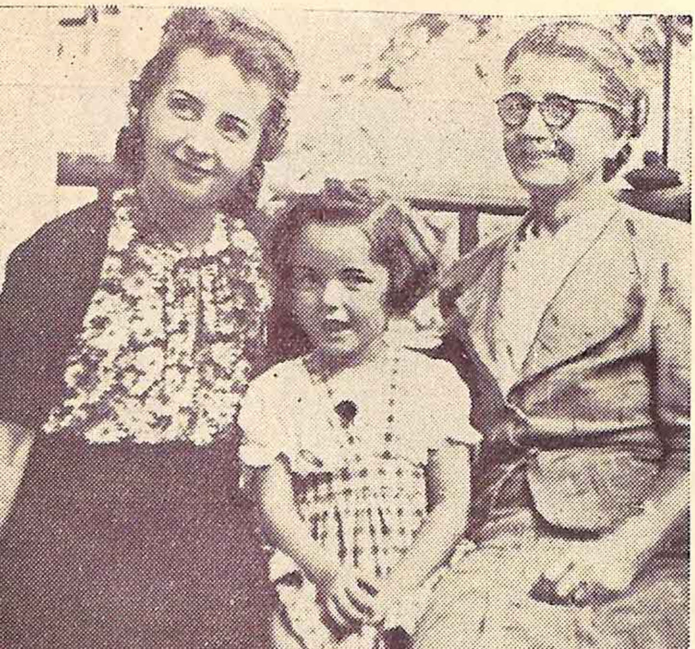




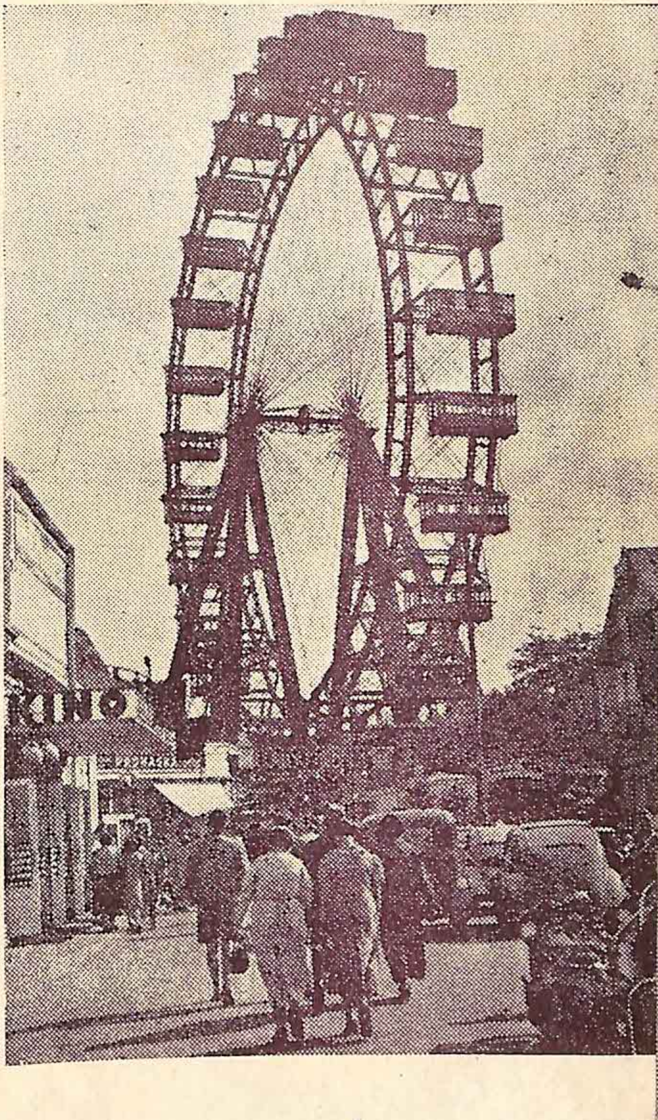
মায়ের কোলে ছোট্ট অনিতা

To little Chutu from
Anita

অনিতার মা. অনিতা ও অনিতার দিদিমা



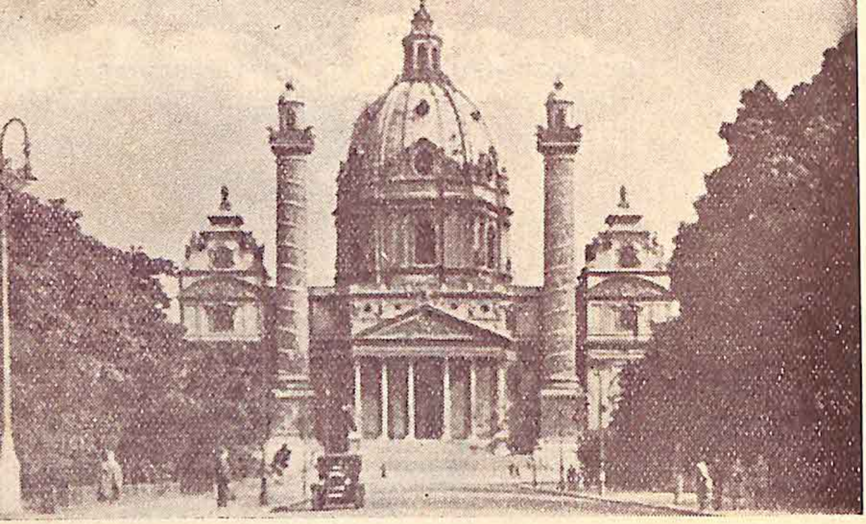
নেতাজীর মেয়ে অনিতা এই সুন্দর কার্ডটি ভারতের ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছে



Best greetings from Vienna

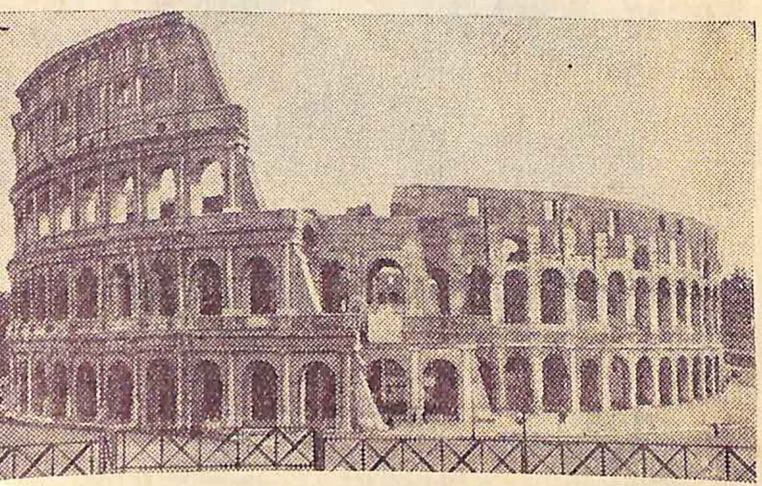
Anita

Vienna, 20th of April 1952



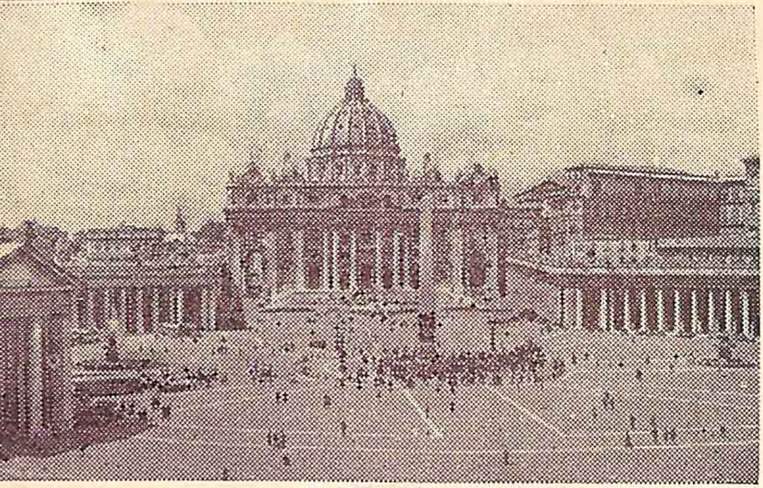
ভিয়েনার একটি সুন্দর দ্রষ্টব্য : বহু লোক বেড়াতে আসে এখানে

রোমের কলোসাল থিয়েটার। প্রাচীন রোমের সম্রাটরা এখানে কৃতদাসদের ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছেড়ে দিত। তারপর হাজার হাজার দর্শক মিলে সেই পৈশাচিক দৃশ্য উপভোগ করত



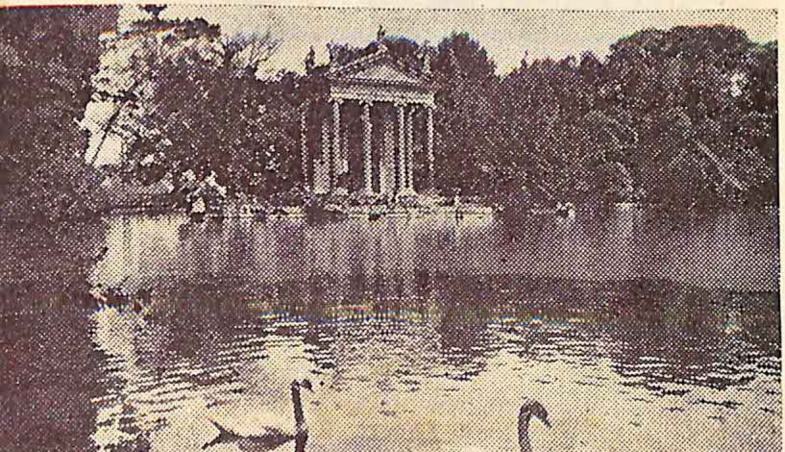


রোমের সাংবাদিক বান্ধবী ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটোর সঙ্গে স্বপনবুড়ো
পিছনে গ্যারিবল্ডীর বিরাট মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে

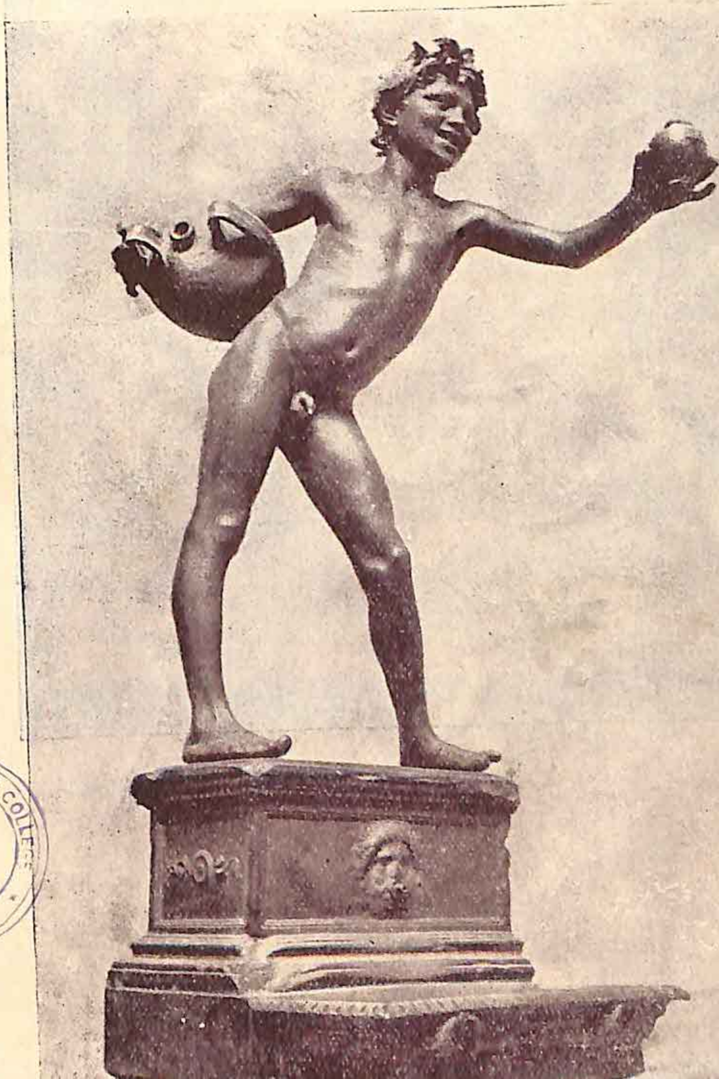


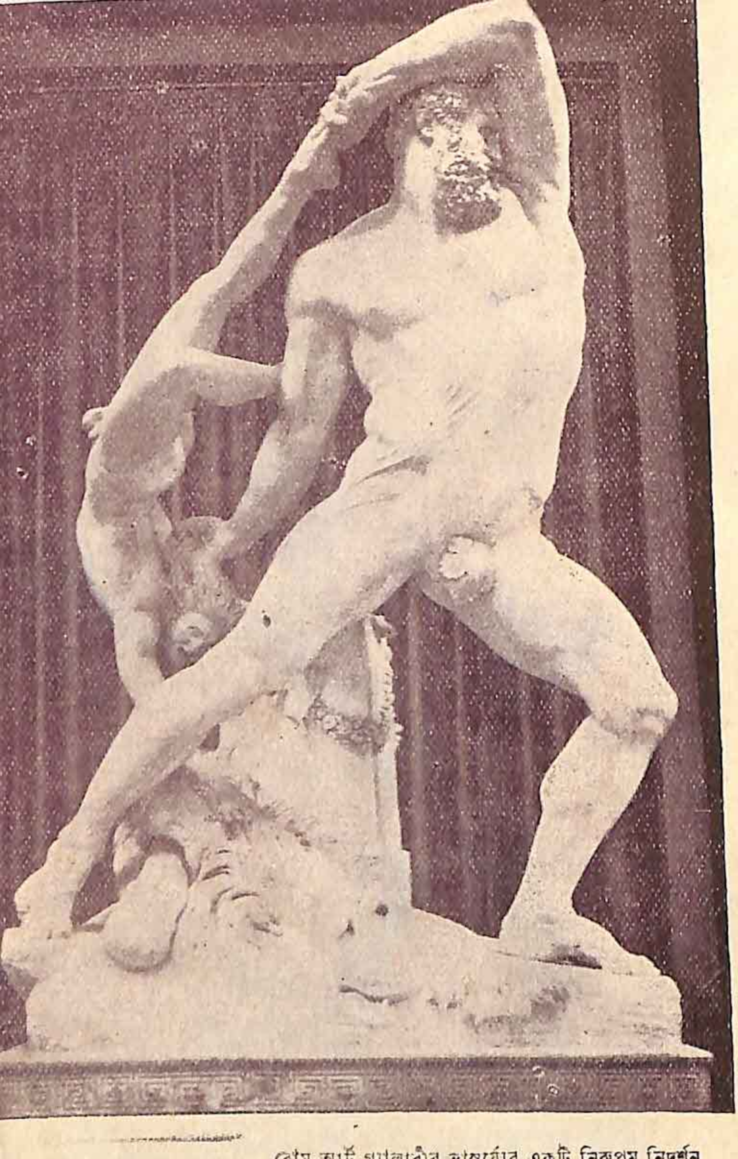
সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার, রোম। অট্টালিকার গাত্রে বিভিন্ন মূর্তি ও চত্বরের ফোয়ারাগুলি স্থানটির সৌন্দর্য্য খুব বাড়িয়ে দিয়েছে

রোম শহরের একটি সুন্দর দৃশ্য



রোম আর্ট গ্যালারীর একটি সুন্দর মূর্ত্তি





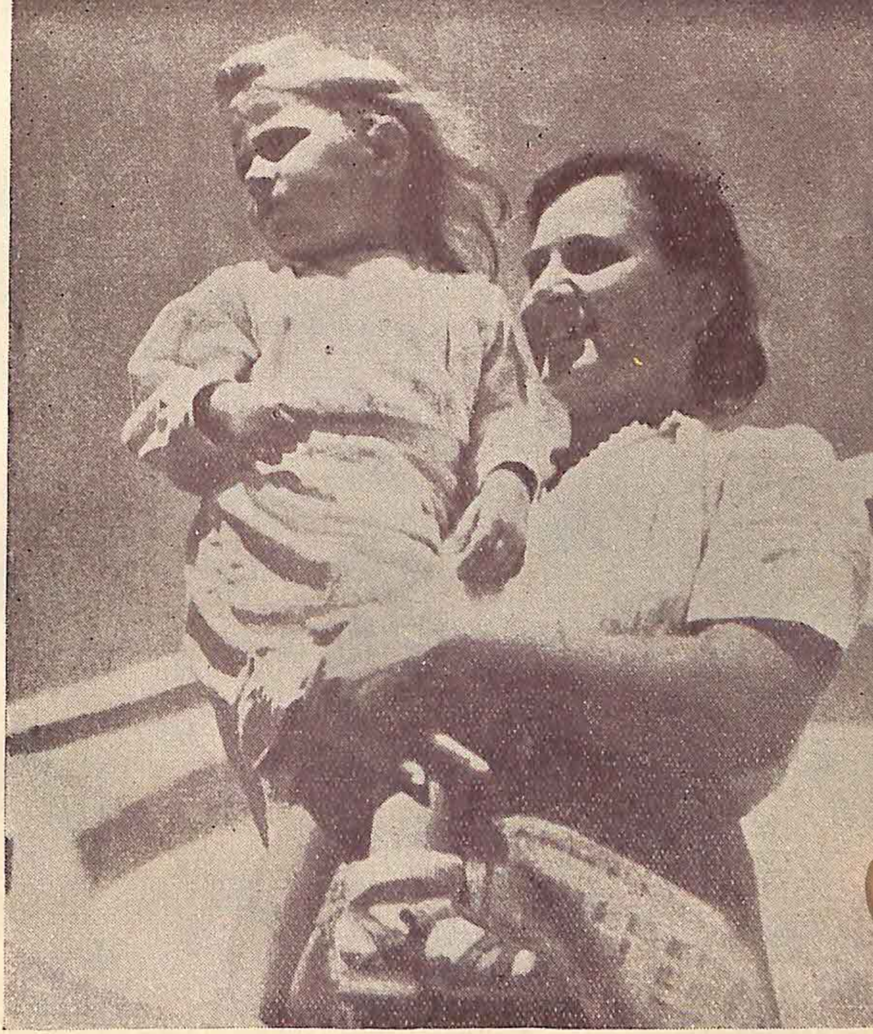
রোম আর্ট গ্যালারীর ভাস্কর্য্যের একটি নিরুপম নিদর্শন



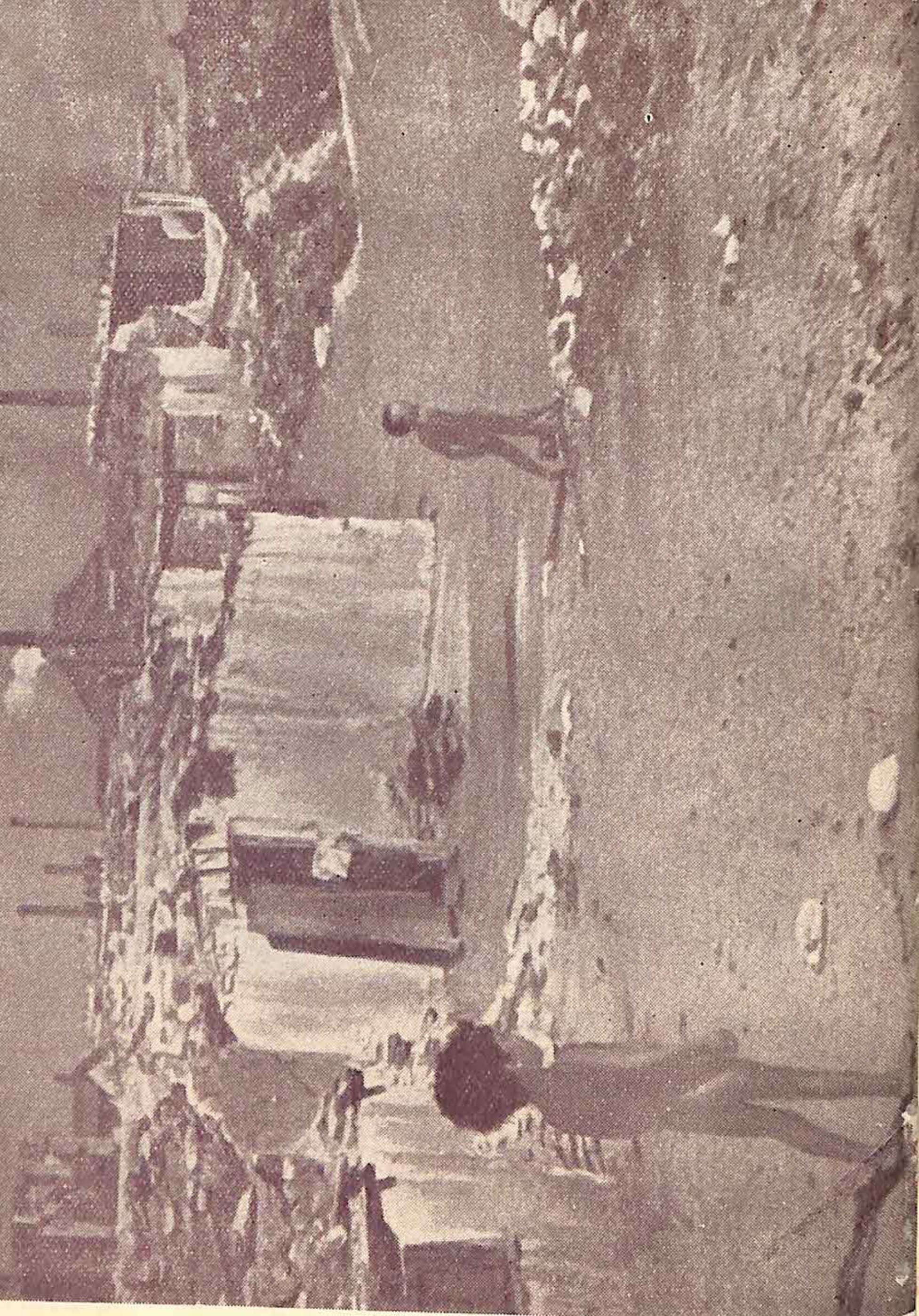
রোমের আর্ট গ্যালারীর একটি তৈল চিত্রের অপূর্ব নিদর্শন



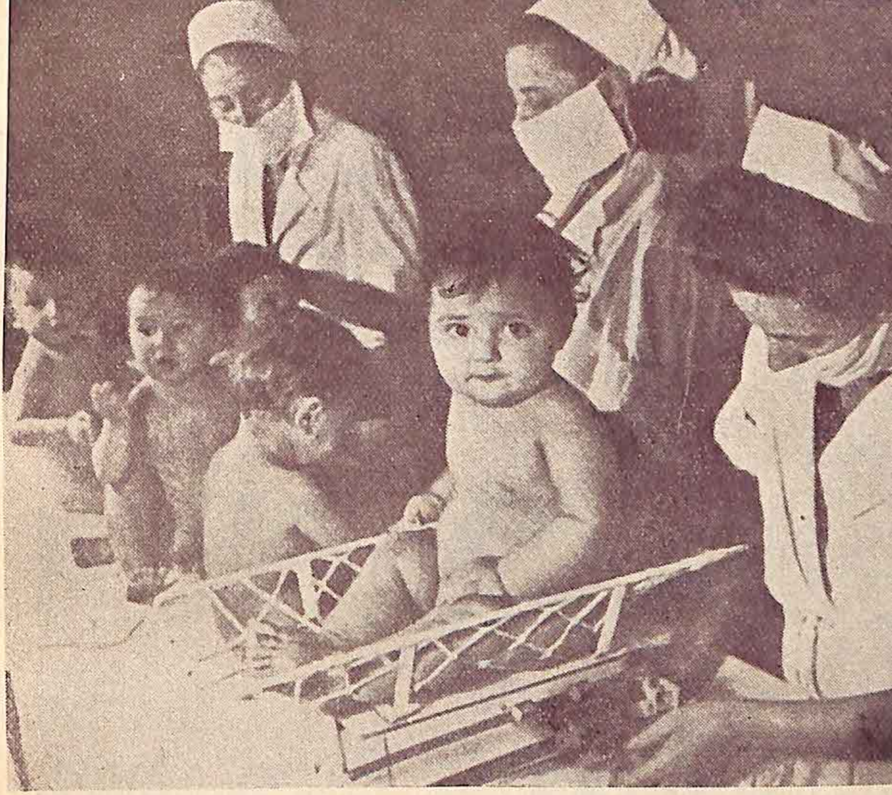
রোম আর্ট গ্যালারীর একটি উল্লেখযোগ্য মাতৃ-চিত্র



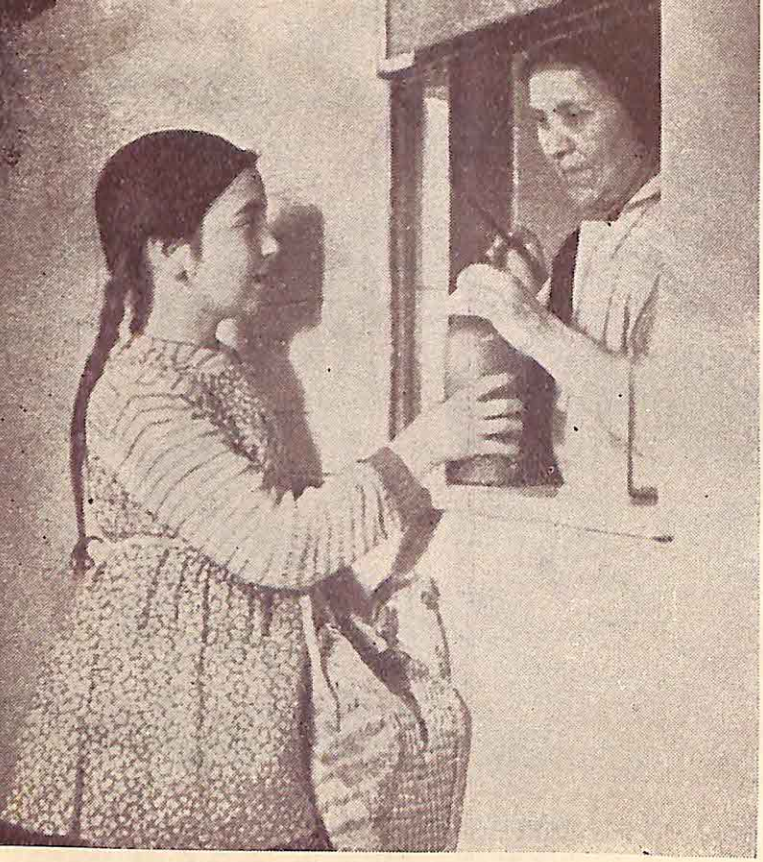
ইউরোপের শ্রমিক মা আর তার মেয়ে



যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় অনাথ ছেলেমেয়েরা যে ভাবে গৃহহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়



ইউরোপের হাসপাতালে অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য শিশুচিকিৎসার নব বিধান



ইউরোপের ছেলে-মেলেরা প্রচুর খাঁটি দুধ পায়



সোনালী রোদ্দুরে বসে—প্রকৃতির সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ইউরোপের ছেলেমেয়েরা গল্পের বই পড়ছে



ইউরোপের ছোট ছেলে-মেয়েরা কেমন হাত ধরাধরি করে খেল্‌ছে





ছোট ছেলে-মেয়েদের ছবি আঁকা শেখার কী আগ্রহ



ইউরোপের মেয়েরা বাজ্‌নার তালে তালে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নাচ শিখছে



ইউরোপের ছেলেদের দিয়ে গড়া একটি পায়োনিয়ার দল

আজ ১লা বৈশাখ ১৩৫৯ সাল। আমাদের নববর্ষ।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেছে—যদিও কাল রাত্তিরে সাড়ে বারো টার আগে ঘুমুতে যেতে পারিনি। আগের দিন সন্ধ্যায় সবুজ সাথী আসর বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়েছে।

অতি ভোরে ঘুম ভাঙবার দুটি জরুরী কারণ আছে।

প্রথম কারণ হচ্ছে, আজ সব পেয়েছির আসরের নববর্ষ উৎসব দেশবন্ধু পার্কে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—আজই আমাকে দুপুর বারোটার সময় কে, এল, এম বিমান যোগে ইউরোপ রওনা হতে হবে। ভিয়েনাতে International Conference in defence of Children-এ (আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলন) ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছি।

একদিকে নববর্ষ উৎসবের প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে ইউরোপ যাত্রার সকল রকম কর্ম্ম-ব্যস্ততার দারুণ চাঞ্চল্য।

এই দুইটি কাজের ঘণ্টা যখন মনের গহনে সকল সময় বাজছে তখন কি আর বেশী বেলা অবধি ঘুমুবার অবকাশ কিম্বা উপায় আছে? অতি প্রত্যূষে বিহঙ্গ তাই নীড় ছেড়ে উঠেছে।

সময় অল্প, কিন্তু কাজ অগুন্তি।

ভগবানের নাম স্মরণ করে চট্‌পট্‌ সব শেষ করে ফেল্‌তে না পারলে দু' নৌকায় পা দেবার মতোই অবস্থা হবে আমার।

কিন্তু পাকা মাঝির মতো বৈঠে চালিয়ে তীরে পৌঁছুতে হবে। তাই প্রাতঃকৃত্য খুব শীগ্‌গির শেষ করে ফেল্লাম।

তারই ফাঁকে সেদিনকার কাগজ পড়া হয়ে গেল। হঠাৎ বাইরে হাঁক শোনা গেল—আমি এসেছি।

আর কেউ নয়, আমাদের সব পেয়েছির আসরের কর্ম্মী জগৎ দত্ত! সে আমাকেও হারিয়ে দিয়েছে সকালে ওঠায়।

দু জনে বসলাম বাইরের ঘরে। অন্দর মহল থেকে গরম হালুয়া আর চা এসে পড়তে দু জনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করা গেল। হারুদার বাসায় গিয়ে দমদমে ফোন করে জান্‌তে হবে ঠিক কটায় আমাকে বিমান ঘাঁটিতে পৌছুতে হবে। সেই সকালেই বলাইবাবু বহুৎ কসরৎ করে ফোনের যোগাযোগ স্থাপন করে জানিয়ে দিলেন যে, সাড়ে দশটার মধ্যে আমার যাওয়া একান্ত ভাবে প্রয়োজন। ইতিমধ্যে হরলাল বর্দ্ধন এসে হাজির।

দেশবন্ধু পার্কে কর্ম্মীরা সব অপেক্ষা করছে। সকাল ঠিক আটটায় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আসবেন। কাজেই উৎসবের আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থা ওরই মধ্যে শেষ করে ফেল্‌তে হবে।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে দেশবন্ধু পার্কের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

ওখানে পৌঁছে দেখি আসরের কর্ম্মীরা অনেকেই এসে হাজির।

যেখানে রাজ্যপাল নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে বসবেন—সেখানে চাঁদোয়া খাটানো হয়ে গেছে। উমাশঙ্করের পরিচালনায় ছেলেরা বিরাট মাঠে লম্বা লম্বা চূণের দাগ কাট্‌ছে। এইখানে সার দিয়ে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে সমবেত ব্যায়াম করবে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন আসরের ছেলেমেয়েরা দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে দেশবন্ধু পার্কে এসে জমায়েৎ হচ্ছে। তাদের হাসি-খুশী মুখ দেখলে অতি বৃদ্ধেরও আবার লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

স্বেচ্ছাসেবকের দল চারদিকে দড়ির বেড়া দিয়ে উৎসব-মণ্ডপ রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। ব্যাণ্ডদলও এসে বাজনা সুরু করে দিয়েছে।

কেন্দ্রের কর্ম্মীরা সবাই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে চলেছে। এরই এক ফাঁকে শিল্প-বিভাগের কর্ম্মীরা নববর্ষের সুন্দর প্রাচীর পত্র হাতে নিয়ে, মণ্ডপের সাম্‌নে দিব্যি করে ঝুলিয়ে দিলে। দিবা, নিশা সবাই পরিশ্রম করছে। আসরের যেসব মেয়ে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে রাজ্যপালকে বরণ করে নেবে তারাও সার দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একটি করে মঙ্গল-শঙ্খ।

হাসিমুখে আমাদের যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ বাবু এসে হাজির হলেন। বল্লেন, আমি ঠিক সময়ে এসে গেছি।

মাঠে ছেলেমেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন ফোটা-ফুলের বাগান। মাইকওয়ালা তার মাইক নিয়ে তৈরী।

সবাইকার মনে-প্রাণে উৎসবের-বাঁশী বেশে উঠেছে এমন সময় পার্কের সদর পথ থেকে জনতার সাড়া জাগলো—এসে গেছেন—এসে গেছেন—

এগিয়ে গেল আসরের কর্ম্মীর দল, সম্পাদককে সাথী করে আমিও ছুট্‌লাম। রাজ্যপালকে সঙ্গে নিয়ে এলাম উৎসব-মণ্ডপে। সেখানে আসরের মেয়েরা শঙ্খ বাজিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। রাজ্যপাল পত্নী আসবেন জানিয়েও আস্‌তে পারেন নি, তাঁর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।

আশে পাশে তাকিয়ে দেখি বহু কাগজের প্রতিনিধিরা এসে জমায়েৎ হয়েছেন। সিনেমা তোলবার জন্যে এসেছেন উৎসাহী ক্যামেরাম্যান, নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদের দেখলাম—আর পেলাম যুগান্তরের বন্ধুদের।

সংস্কৃত স্তোত্র দিয়ে বর্ষবরণ সুরু হল।

তারপর এক বছর ধরে যে সব সোনারকাঠিকে আমরা হারিয়েছি তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের জন্য সকলে এক মিনিটকাল দাঁড়িয়ে রইলাম।

এরপর সুরু হল—আমাদের আসরের উদ্বোধন-সঙ্গীত "জাগো কিশোরী—জাগো কিশোর"

নববর্ষের পুণ্য-প্রভাতে গান খানি এত মিষ্টি শোনালো যে কী বল্‌ব !

ইউরোপ যাত্রার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমি হাজার হাজার সোনার কাঠি ভাই-বোনদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। মনে হল সকলের শুভেচ্ছা যেন আমাকে বর্ম্মের মতো ঘিরে রয়েছে।

বিবেকানন্দবাবু প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলেন এবং ছোটদের আশীর্ব্বাদ জানালেন। এর পর সুরু হল ছেলেমেয়েদের সমবেত ব্যায়াম।

এরই ফাঁকে রাজ্যপাল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজই যখন আপনার ইউরোপ যাত্রা তখন ত' চারটি মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে নিতে হবে ? আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম,—অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে চলে গিয়ে কাজ শেষ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কেননা সাড়ে নটার সময় আমাকে বেরুতে হবে।

যখন প্রবল উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের মধ্যে সমবেত ব্যায়াম চল্‌ছে তার ভেতর বিদায় নিয়ে চলে এলাম উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে। কেননা —দমদম বিমান ঘাঁটির জন্যে তৈরী হতে হবে।

বাসায় ফিরে গরম ভাত, তারই সঙ্গে খাঁটি গাওয়া ঘী, মাছ ভাজা আর দই দিয়ে বেশ আরাম করে খাওয়া শেষ করলাম। আগে থেকেই কথা ছিল আমার প্রতিবেশী বন্ধু প্রভাসবাবু তাঁর গাড়ী করে দমদম পৌঁছে দেবেন। তাতে সুবিধে হবে, এই যে পাড়ার

ছেলেমেয়েরা আমাকে গিয়ে তুলে দিয়ে আস্‌বে আর ফিরতি কালে প্রভাসবাবুর সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসতে পারবে। প্রভাস বাবুর মেয়ে কুহু টিপ পরে তৈরী হয়ে আছে, সে-ও জ্যাঠাকে দমদম পৌঁছে দিয়ে আসবে আর এরোপ্লেন দেখবে। আমার চার ছেলে-মেয়ে বুবু, টুটু, পুলক ছুটুর মধ্যে—ছুটুকে কোনো রকমে বাদ দেয়া গেছে। ওদিকে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে—হারুদার মেয়ে বুচ্‌কি ছেলে টুটু, আর বিনোদবাবুর মেয়ে সুনন্দা।

ওরা সবাই মিলে গাড়ী দখল করে বসল।

পাড়া শুদ্ধু সবাই যে আমায় কত আপনার বলে মনে করেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই সুদূর বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে। তেতলা থেকে নন্তুদা চীৎকার করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, কবিবন্ধু শৈলেন রায় এসেছে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে, বৌদি (হারুদার স্ত্রী), সেলু আর তার ভাইবোনেরা উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ীর দোর গোড়ায়, বিনোদ বাবু আর তার স্ত্রী অতি নিকট আত্মীয়ের মতো উপস্থিত হয়েছেন, বেলা বোনদের নিয়ে তাদের বাড়ীর সাম্‌নে হাজির, বাঁটুল ভাইদের বাড়ীর মেয়েরা দোতলা থেকে জান্‌লা খুলে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন—

বন্ধুবর প্রভাসবাবুর পাশে গিয়ে বস্‌লাম। সকলের সমবেত শুভেচ্ছা আর প্রীতি-জ্ঞাপনের মাঝখান দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। দমদমের সারাটা পথ আমাদের কুহু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে ভারী আনন্দ দিলে।

দমদমে পৌঁছে জানা গেল কে, এল, এম বিমান বেশ খানিকটা দেরী করে ফেলেছে। আমরা সবাই মিলে কে, এল, এম বিমানের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে আমার জন্য আর একটি বিস্ময় জমা হয়ে ছিল! আমার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু প্রভাংশু গুপ্তের (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) আত্মীয় এই অফিসের

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী এখানকার সর্ব্বজন পরিচিত মিঃ সেন। তাঁকে পেয়ে আমার ভারী সুবিধে হয়ে গেল। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে আমার মালগুলি ওজন করে লেবেল এঁটে দেবার ব্যবস্থা করলেন আর আমি তৃষ্ণার্ত্ত জেনে—আইসক্রীম সোডা পান করালেন।

ইতিমধ্যে সব পেয়েছির আসরের কর্ম্মীদল একে একে আস্‌তে লাগলো আমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্যে। তখন বুঝলাম যে, আমাদের নববর্ষ-উৎসব শেষ হয়ে গেছে।

প্রথমে এলেন অনিলবাবু কল্যাণীয়া দিবাকে সঙ্গে করে। জগু আর জগৎ এসে হাজির। তারা আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে খুব হৈ-চৈ সুরু করে দিল। আরো খানিক বাদে আমাদের মূল সত্যসেবী—রমাকান্ত দত্ত একেবারে মালা নিয়ে এসে হাজির। এরা এই দমদম বিমান ঘাঁটিতে একটা মজাদার দৃশ্যের সৃষ্টি না করে ছাড়বে না দেখছি! আমাদের দু'জন ক্যামেরাম্যান বন্ধুও এসে হাজির। উৎসাহ তাদের অপরিসীম। ছবি না তুলে ছাড়বে না। আমাদের হরলাল ভাই এসেই আমাকে ধমক দিতে সুরু করল। আমি পাউণ্ড ভাঙিয়ে ইটালীর মুদ্রা লীরা নিয়েছি কিনা। যখন জানতে পারল যে, আমি সে সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাই করিনি তখন সে আমায় টান্‌তে টান্‌তে টাকা-কড়ি বিনিময়ের অফিসে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। চার পাউণ্ডের বিনিময়ে পেলাম ৭৫৬০ লীরা। মহানন্দে তখন ফিরে এলাম অপেক্ষা করবার প্রশস্ত কক্ষে। প্রস্তাব উঠ্‌ল সবাই মিলে ছবি তুল্‌তে হবে।

অফিসের বাইরে সুন্দর বাগানের পাশে এসে আমরা হাজির হলাম। প্রভাসবাবু, অনিলবাবু, জগু, জগৎ, হরলাল, বুবু, টুটু, পুলক, বুচ্‌কী, সুনন্দা, দিবা (মিনতি) ছোট টুটু—এমন কি বাচ্চা কুহুকে নিয়ে আমরা সবাই ফটো তুল্‌লাম।

খবর পাওয়া গেল যে, এইবার কাষ্টম অফিসে গিয়ে যথারীতি সঙ্গের মালপত্র দেখাতে হবে। সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাষ্টম হাউসে হাজির হলাম। দল বেঁধে যাত্রীদের 'পাসপোর্ট' দেখাতে হল। কাষ্টমের কর্ম্মচারীরা আমায় খাতিরই করলেন বল্তে হবে। কেননা—তাঁরা ভেতরের কোনো জিনিষ না দেখেই ছেড়ে দিলেন। অবশ্য পরিচয় দিয়েছিলাম যে, আমি যুগান্তর কাগজের সাংবাদিক। এর পর টিকা দেবার নিদর্শন দাখিল করতে হল স্বাস্থ্য বিভাগে। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে ভেতরের বিরাট প্রাঙ্গনে আস্তেই দেখি অনেক দূরে—আগত ভদ্রলোকের অপেক্ষা করবার গণ্ডীবদ্ধ যায়গা থেকে আসরের শিল্পী গোপাল দে আর শৈলেন দাশ আমায় হাত ইসারা করে ডাক্‌ছে। তারাও আমার হাতে একটি পরম প্রীতির নিদর্শন মালা তুলে দিল। আর দেখা হল শিল্পীবন্ধু ধীরেন বলের সঙ্গে। সেও দেরী করে এসেছে। কিছুই কথা হতে পারল না। কেননা কে, এল, এম, অফিসার জানিয়ে দিলেন যে, তখন আমাকে ঘরে গিয়ে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এলাম অপেক্ষমান যাত্রীদের পাশে। এখন আমি ছাপ-দেয়া আলাদা লোক হয়ে গেছি। যারা আমায় বিদায় দিতে এসেছে আর তাদের সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার সুযোগ জুটবে না!

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাক এলো। এইবার আমাদের বিমানে চড়তে হবে। দল বেঁধে Run wayর ওপর দিয়ে সবাই এগিয়ে চল্‌লাম বিমানের দিকে। দূর থেকে আসরের কর্ম্মীরা আমায় দেখতে পেয়ে হাত তুলে, রোমাল নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে লাগ্‌লো। আমার হাতে ছিল ওদের দেয়া ফুলের মালা। আমি তাই নেড়ে ক্রমাগত তাদের সম্ভাষণের জবাব দিলাম।

কিছুক্ষণ সময় গেল যন্ত্র গরম হতে। তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে আকাশে পাখা মেলে বিরাট গড়ুর পক্ষী উড়ল নীল গগনে। আমি জানালা দিয়ে ওদের সবাইকে দেখ্‌তে পেলাম। কেননা আমি পাশের দিকের আসনে বসেছিলাম। দেখ্‌লাম তখনো ওরা হাত নাড়ছে, রোমাল ওড়াচ্ছে, মাথা দুলিয়ে চীৎকার করছে। বাঙ্‌লা মায়ের স্নেহ-কোমল মাটি আমার কাছ থেকে দূরে—দূরে আরো দূরে চলে গেল।

হ্যাঁ, বল্‌তে ভুলে গেছি যে, বিমান ওড়বার আগে বিমান বালিকা এসে আমাদের কোমরে বেল্ট্‌ বেঁধে দিয়ে গেছে—আর দিয়েছে Chewing gum.

বিমান আকাশে ওড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে লাল সাবধানী অক্ষর জ্বলে ওঠে—"Dont smoke Fasten your Belts" তখুনি চুপচাপ ভালো মানুষ হয়ে বেল্ট বেঁধে শান্ত সুবোধ বালকের মতো ব্যবহার না করলেই বিপদ। অবশ্য অন্য সময় যাত্রীরা ইচ্ছা করলে ধূমপান করতে পারেন—তাতে কোনো বাধা নেই।

বিমান দ্রুতবেগে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—কোলকাতা শহর তাল গোল পাকিয়ে খেলাঘরের মতো ছোট্ট হয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টিপথ থেকে কোথায় দূরে মিলিয়ে গেল।

কাছের মানুষগুলি যখন দূরে চলে যায় তখন নতুন পরিবেশে আশে পাশে তাকাবার অবকাশ ঘটে। নানা ধরণের যাত্রী আছে এই ডাচ্‌ বিমান খানিতে। ইন্দোনেশিয়ান, আমেরিকার লোক, খাস বৃটিশ, জাপানী যাত্রী, পাকিস্থানী যাত্রী সবাই এসে এই উড়ন্ত মুসাফের খানায় জমায়েৎ হয়েছে।

বিমান খানির ভেতর মায়েদের সঙ্গে শিশুরও অভাব নেই। তাদের শুইয়ে রাখ্‌বার ছোট ছোট অভিনব খাটেরও

ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান মানুষের সুখ-সুবিধের জন্যে যে কতখানি মাথা খাটিয়েছে তা এই বিমানে (বিশেষ করে কে, এল, এম) এ উঠলে বোঝা যায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সরকার মশাই আমায় বলে দিয়ে ছিলেন যে, বিমানের রাজা হচ্ছে কে, এল, এম প্লেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, খাওয়া দাওয়া ও আতিথ্যের রাজসিক বন্দোবস্ত নাকি আছে এখানে। বিমানে উঠে বুঝ্‌লাম যে, যতীনবাবু এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। যাত্রীদের আরামের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা ত আছেই—তা ছাড়া আছে ঘড়ি-ঘড়ি রকমারী খাবার পরিবেশনের ঘটা। বলা বাহুল্য সবই বিনামূল্যে পরিবেশিত হয়। তার মানে হচ্ছে—টিকিট কেনার সময় যে দাম দেয়া আছে তার বেশী এক কড়িও এঁরা বাড়তি আদায় করেন না। Sea sickness এর মতো Air sickness বলেও একটা কথা আছে। পাছে যাত্রীরা সেই রোগে ভোগে সেইজন্যে প্লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনা বালিকারা এসে এক রকম সুগন্ধী জল দিয়ে রোমাল ভিজিয়ে দিয়ে যায়। তাই দিয়ে ঘন ঘন মুখ, চোখ, কপাল মুছে ফেল্‌তে হয়—একেবারে অব্যর্থ ঔষধি। মন মেজাজকে ঠাণ্ডা করতে দেরী লাগে না।

যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছেন, কেউ নানাদেশীয় পত্রিকা পাঠ করছেন—আবার অপরে ঘুমের আয়োজন করে বসে আছেন।

আমারও যে ঘুম না পেয়েছিল তা নয়।

হঠাৎ একি কাণ্ড! হি-হি ব্যাপার—গায়ে হুঁ-হুঁ কাঁপুনি। দারুণ শীত লেগেছে।

বিমান কত ওপরে উঠে গেছে কে জানে!

মাথার ওপরেই ছোট ছোট বাঙ্ক। তাতে যাত্রীদের জন্যে কম্বল সাজানো থাকে। শীতের প্রচণ্ড তাড়ায় অনেকেই একখানি করে কম্বল টেনে নিয়ে দিব্যি ঘুমের আয়োজন করে নিলাম।

হঠাৎ সাবধান-বাণী শোনা গেল—করাচী এসে যাচ্ছে সবাই তৈরী হয়ে নাও। বিমানের লোকরা একটি করে ছাপানো ফর্ম্ম দিয়ে গেল—তাতে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। সেইগুলি পুরণ করে পাস্‌পোর্টের সঙ্গে জমা দিলে তবে করাচী এয়ার পোর্টে ঢুক্‌তে দেবে। অন্যান্য যাত্রীর মতো আমিও ফর্ম্মটি পুরণ করে দিলাম।

হ্যাঁ, ইতিমধ্যে এক বাক্স করে চকোলেট দিয়ে গেছে প্রত্যেক যাত্রীকে—তা ছাড়া দুপুরে জুটেছে লাঞ্চ। প্রথমে কথা ছিল—দমদম এয়ার পোর্টে লাঞ্চ দেয়া হবে। কিন্তু বিমান এসে পৌঁছুতে দেরী করায় সেই লাঞ্চ আমরা পেলাম আকাশ পথে। লাঞ্চ খাওয়ার পদ্ধতিটা কল্‌কাতার বহু নাম-জাদা হোটেলে আগে থেকেই রপ্ত করা ছিল। তবে বিমানের ওপরে শুনেছিলাম 'বিফ্' দেয়। তাই ভয়ে ভয়ে মাংসটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি অন্যান্য বস্তুতে উদর ভর্ত্তী করা গেল। কল্‌কাতার বাসার ভাত অনেকক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছিল। তাই বহুক্ষণ বাদে বিমানের ওপরকার লাঞ্চটা মুখরোচক বলেই মনে হল।

আবার সেই লাল সাবধান বাণী—বেল্ট্ বেঁধে বোসো।

কাজে কাজেই সবাইকেই শান্ত সুবোধ ছেলে হয়ে বস্‌তে হল।

করাচী বন্দরে আমরা গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন কল্‌কাতার সময় পৌনে ছটা। ওদের সময় এক ঘণ্টা কম—পৌনে পাঁচটা।

তার মানে—কল্‌কাতার এক ঘণ্টা পরে করাচীতে সূর্য্যদেব মুখ দেখান।

বিকেলের আলো বেশ ভাল লাগ্‌লো করাচীতে বিমান থেকে নেমে। পাস্‌পোর্ট জমা দেবার পালা সাঙ্গ করে—কে-এল-এম বাসে চেপে আমরা গিয়ে হাজির হলাম—ওদেরই মনোমুগ্ধকর বিশ্রাম ভবনে (Rest house)

প্রথমেই হাতে হাতে একখানি করে চিরকুট মিল্‌লো। তাতে লেখা রয়েছে, এই স্লিপ্‌টি জমা দিলে তোমার মনোমত এক গেলাস স্নিগ্ধ পানীয় মিল্‌বে।

আমি আমার প্রিয় পানীয় 'অরেঞ্জ কোয়াস্‌' জোগাড় করে টেবিলে বস্‌লাম আর এই প্রথম চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লাম করাচী থেকে। আমার ছেলে মেয়েদের কাছে চিঠি লেখা শেষ করে একজন পরিচারিকাকে ডাক্‌লাম। তিনি জানালেন চিঠি লিখ্‌তে কিন্তু পয়সা দিতে হবে। আমার কাছে ছিল ভারতীয় মুদ্রা—তাই চার আনা দিয়ে চিঠিখানি পোষ্ট করতে তাকে অনুরোধ করলাম।

করাচীতে কে-এল-এম বিশ্রাম ভবনের বাগানটি ভারী সুন্দর আর আরামপ্রদ। বাথরুমে মুখচোখ ভাল করে ধুয়ে ফেলে সেই বাগানে বেড়াতে লাগ্‌লাম। মধুর দখিনা বাতাস বইছিল বাগানখানিতে। গরমও খুব তীব্র নয় এখানে। নাতিশীতোষ্ণ বলা চলে। ফুলের বাগানের ভেতর বেড়াতে বেড়াতে এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। এঁর নাম কেন্‌জো জোসিদা। ইনি টোকিও থেকে লণ্ডন যাচ্ছেন একটা International conference উপলক্ষে। ভদ্রলোক খুব আলাপী। কিছুদিন আমেরিকাতেও পড়াশুনা করেছেন। আমাকে দেখে অনুমান করলেন—আমি নাকি তারই সমবয়েসী—বছর ছত্রিশ হবে। যখন জানালুম এখন আমার অনেক বয়েস তিনি ভারী অবাক হলেন।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তিনি আমার একটি ফটো তুল্‌তে চাইলেন। তাঁর ইচ্ছে আমরা দুজনে এক সঙ্গে ছবি তুলি। তখন প্রশ্ন উঠ্‌ল, তাহলে ক্যামেরাতে ছবি তুল্‌বে কে? তিনি নিজেই উৎসাহিত হয়ে একজন মুশলমান বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে এলেন। সে বেচারী জীবনে বোধ করি ক্যামেরা স্পর্শ করে নি। কিন্তু জাপানী ভদ্রলোকের অদম্য উৎসাহ। তিনি সব বুঝিয়ে দিলেন ওকে—কি করে ফটো তুল্‌তে হয়। তাঁরই নির্দ্দেশে আমরা দুজন বিকেলের পড়ন্ত রোদে ফোটাফুলের বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই বেয়ারা তুল্‌লো ফটো। তুল্‌লো মানে একটা ক্লিক্ শব্দ শোনা গেল। ফটো যে কি রকম হল তা' মা যশোদাই জানেন!

আমি অনুরোধ করলাম, ফটো যদি ভালো হয়—তবে এক কপি যেন আমি পাই। তখন দু জনের মধ্যে ঠিকানা বিনিময় হল।

এই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আর একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। বয়েস তার মাত্র আঠারো বছর। সে যাচ্ছে লণ্ডনে ইংরেজী পড়তে। ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল থেকে এসেছে। ছেলেটি বাড়ী ছেড়ে এসে ভারী মন মরা হয়ে পড়েছে। তাকে একটুখানি উৎসাহ দেয়া আর প্রেরণা জোগানো দরকার।

স্বপনবুড়োর কাজই ত' ওই। দেখ্‌তে পেলাম, ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার কাজ তা হলে বিদেশেও ঠিক আছে। ছেলেটিকে বেশ খানিকটা প্রবোধ দিলাম। বাড়ীর কুশল প্রশ্ন করলাম। কিন্তু মুস্কিল বাঁধলো এই যে, ছেলেটি ভালো করে ইংরেজী বল্‌তেও পারে না। কি করে যে লণ্ডনে ইংরেজী পড়াশুনা চালাবে সেই কথা ভেবে শঙ্কিত হলাম। আমিও যে খুব ভালো ইংরেজী জানি তা নয়—তবে কথা-বার্ত্তা দিব্যি চালিয়ে যেতে পারি—কোথায়ও আট্‌কায় না।

এর খানিক বাদে আমাদের ডিনার টেবিলে ডাক পড়ল। জাপানী ভদ্রলোক, সেই তরুণ ছাত্র ও আমি এক টেবিলে বস্‌লাম। দেখ্‌লাম খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সেই জাপানী ভদ্রলোক খুব ওয়াকিবহাল। আমরা দু'জনেই দিব্যি মাংস রুটি চালিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। আমাদের ছাত্র বন্ধুটি হাত গুটিয়ে বসে রইল।

আমি দেখ্‌লাম সমূহ বিপদ। তখন বেয়ারাটিকে ডেকে আমিই মুরুব্বি সেজে তাকে ডিম দিতে বল্লাম। ডিম পেয়ে ছেলেটি তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াটা শেষ করল। নইলে ওকে অভুক্তই থাক্‌তে হত। করাচীতে এক রকম মিষ্টি বাতাবী লেবু খাওয়ালো—ভারী সুন্দর তার স্বাদ। বাঁধা কপি সেদ্ধটা যে খুব ভালো লাগ্‌লো তা নয়—তবে মাংসের সঙ্গে শাকসব্জী খেতে হয় বলেই ওটা নুন মাখিয়ে মাখিয়ে খেয়ে ফেল্লাম। শুনেছিলাম মুশলমান বাবুর্চিরা মাংস খুব ভালো রান্না করে। কল্‌কাতার হোটেলের চাইতে করাচীর রান্না মাংস যে খুব বেশী উপাদেয় সেকথা হলফ্‌ করে বল্‌তে পারি না। তবে ক্ষিদের সময় খেতে মন্দ লাগ্‌লো না।

খাওয়ার পাট শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল করাচীর আকাশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—রাশি রাশি তারা ফুটেছে আকাশে, দিব্যি ফুর ফুরে হাওয়া। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে—

বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল
রাজার বাগানে ফুটেছে বকুল, পারুল রজনীগন্ধা।

সত্যি করাচীর সেই বাসন্তী-সন্ধ্যা আমার মনে বেশ দোলা দিয়ে গিয়েছিল। মৃদু মন্দ সমীরণ আর ফুলের সমারোহের মধ্যে সেই মধুর সন্ধ্যায় করাচীকে ভালো বেসে ফেলেছি।

জানি না—অন্য ঋতুতে তার রূপ কেমন!

জাপানী ভদ্রলোক বল্‌ছিলেন—তিনি এবং তার এক বন্ধু টোকিওতে পুস্তকের ব্যবসা করেন। ভারতীয় জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা যদি কোনো বই তিনি পান তবে জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে রাজি আছেন। তবে লেখকের সঙ্গে দুইটি সর্ত্ত থাক্‌বে। প্রথম হচ্ছে, জাপানী ভাষার কপিরাইট তাঁদের থাক্‌বে, দ্বিতীয়, সাড়ে সাত পার্সেণ্ট কমিশন লেখক পাবেন। আমি জানালাম, কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে আমি এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারবো।

আবার বাসে করে সবাই ফিরে এলাম করাচী এয়ার পোর্টে। সেখানে স্থানীয় কর্ম্মচারীর কাছ থেকে যে যার পাস্‌পোর্ট উদ্ধার করে বিমানে আরোহন করা গেল।

একটা কথা পাঠক-পাঠিকাদের বলতে ভুলে গেছি যে, আমার এই চল্‌তি পথের কাহিনী বিমানে বসেই লিখ্‌তে সুরু করেছি। প্রত্যেকের আসনের সামনে অস্থায়ী ভাবে ছোট্ট টেবিল তৈরী করা যায়। খাওয়া দাওয়া আর লেখাপড়া এই টেবিলের ওপরেই চলে। আমিও চট্‌পট্‌ টেবিল সাজানো পদ্ধতি শিখে নিয়ে এই লেখা সুরু করে দিয়েছি। যদিও বিমান চলা-কালে টেবিলটা একটু কাঁপে তবু আমার উৎসাহের অভাব নেই। কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে সমানে লিখে চলেছি। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' নাটকের ভূমিকাটি মনে পড়েছে :—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা
তারই শ খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে—
মস্তিষ্ক-কোটর বাসী—
চিন্তা-কীট রাশি রাশি
পদ-চিহ্ন গেছে যেন রেখে!

সব পেয়েছির আসরের কেন্দ্রের কর্মীরা রওনা হবার আগে এই খাতা খানি আমার হাতে তুলে দিয়েছে। সেই খাতার পাতাগুলি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে চলেছি আমি।

করাচীতে ডিনারটি বেশ পরিপাটি রকমই হয়েছিল। কথায় বলে, ভূরি আর মুড়ি ঠাণ্ডা থাক্‌লে—সব কিছুই ঠাণ্ডা ভাবে চল্‌তে পারে। ভূরি ভোজনের পর যেটা হওয়া স্বাভাবিক এক্ষেত্রে তাই হল। বিমানে ফিরে এসে লম্বা ঘুম দিলাম—কম্বলখানি টেনে নিয়ে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ জোর আলো জ্বলে উঠল।

কিরে বাবা! আচম্‌কা এত আলোর ঝলকানি কেন? কোনো বিপদ-টিপদের সঙ্কেত নাকি?

জানা গেল ভয় পাবার মোটেই কিছু নেই। যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

কল্‌কাতার সময়ে তখন রাত প্রায় আড়াইটে।

যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে কফি দেয়া হবে। বাঙালী বাড়ী হলে তত্ক্ষণ হাঁক-ডাক পড়ে যেত!

—ওরে রামা, ও ঝি, শীগগীর উনুনে আগুন দে। বাবুকে চা করে দিতে হবে!

ফলে পাড়া শুদ্ধু সবাই জেনে গেল, বাবু চা খাবেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপার আলাদা। শুধু আলো জ্বালিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল—তোমার এখন জাগা দরকার, কফি তৈরী।

অত রাত্তিরে আচম্‌কা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে—রাগ একটু হবারই কথা। কিন্তু গরম কফি খাইয়ে সেটা পূরণ করিয়ে দিলে। ডাচ্‌ বালিকার মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছে করলে—তাকে দেখন-হাসি বলেও ডাক্‌তে পারেন।

হাতে হাতে চলো এলো একটি কাগজ তাতে ছবি আঁকা আর

লেখা। সেই কাগজে বলে দেওয়া হয়েছে—এই বিমানের ক্যাপ্টেন কে, পরিচারক-পরিচারিকাদের নাম কি, বিমান এখন কোন অঞ্চল দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ভেতরের আর বাইরের উত্তাপ কত, বোগদাদ পৌঁছতে আর কত দেরী—এই সব খুঁটিনাটি খবর। খবরটি পড়ে পরবর্ত্তী যাত্রীর হাতে চালান করে দিতে হবে। এই ভাবে গোটা বিমানের যাত্রীরা জান্‌তে পারবে সন্দেশটি।

শেষ কালে সকলের পড়া হয়ে গেলে বিমান বালিকাকে ডেকে আমি বল্লাম, এই ভ্রমণের একটা কাহিনী লিখছি। কাগজখানি কি আমি পেতে পারি? মেয়েটি মৃত্থ হেসে কাগজখানি আমার হাতে এনে দিলে। আমি সযত্নে ভাজ করে সেটি পকেটে রেখে দিলাম। মুখে বল্লাম, ধন্যবাদ।

স্মিতহাস্যে বিমান-বালিকা প্রস্থান করল।

তারপর এসে গেল সেই বিখ্যাত "Thief of Bogdad" এর রাজ্যি। কল্‌কাতার সময় তখন রাত সাড়ে তিনটে। স্থানীয় সময় রাত একটা। বিমান থেকে বেরুতেই তীব্র শীতল কন্‌কনে হাওয়া যেন দু গালে চড় মেরে গেল!

এতটা যে ঠাণ্ডা হবে আগে বুঝতে পারিনি। তা হলে যথারীতি সাবধান হয়ে ওভার কোটটা গায়ে দিয়ে বেরুতে পারতাম। যাই হোক গতস্য শোচনা নাস্তি।

হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বোগদাদ রাজ্যের বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছুলাম। আগে থেকেই আমাদের পাস পোর্ট সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল। সত্যি, বেশ শীত পড়েছে এই বোগদাদ রাজ্যে। বোধ করি বোগদাদের চোরের দলও এই নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে আকাশে ফুটে রয়েছে রাশি রাশি তারা। যেন ভেল্‌ভেটের ওপর মণি-মুক্তা কেউ সাজিয়ে রেখেছে

থরে থরে। বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। কিন্তু তীব্র কন্‌কনে হাওয়ার জন্যে বাইরে দাঁড়ায় কার সাধ্যি।

এই শীতের রাত্রে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হল—ইন্দোনেশিয়ার এক মন্ত্রীর সঙ্গে। ইনি Public Works Dept. এর মন্ত্রী। কথা-প্রসঙ্গে জানালেন যে, তিনি কিছুদিন আগে দিল্লীতে বেড়াতে এসেছিলেন—ভারতের Public Works এর গতি-প্রগতি সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। ভারতের সংগঠনমূলক কাজের নমুনা দেখে তিনি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছেন। যদিও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে এত দ্রুত কাজ করা সম্ভবপর হবে না—তবু একথা নিশ্চয় যে, তাঁরা দেশ গড়বার কাজে এগিয়ে যাবেন বলেই আশা রাখেন।

ভদ্রলোক খুব অমায়িক। একটা দেশের মন্ত্রী বলে তাঁর কোনো গর্ব্ব কিংবা গাম্ভীর্য্য নেই। বয়সেও বেশ তরুণ বলে মনে হল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল—করাচী থেকে ত' কল্‌কাতায় চিঠি লিখেছি—এই দারুণ শীতের রাত্রে যদি "বোগদাদের চোরের দেশ" থেকে দেশে চিঠি লেখা যায় তবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা চাঞ্চল্য আর অভিযানের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাক্‌বে।

যে কামরায় বসে আমরা চা-বিস্কুট খেয়েছিলাম—সেখানে এগিয়ে গিয়ে একটি বেয়ারাকে কাগজ, খাম ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে যে, চিঠি লিখবার কোনো ব্যবস্থাই এখানে নেই।

কি আর করা যাবে! বোগদাদ হেন দেশে উচ্চবাচ্য করা বিশেষ উচিত হবে বলে মনে হল না। একে ত বোগদাদ চোরের রাজ্যি, তার ওপর হারুণ-অল-রসিদ কোন খানে ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে কে জানে। কোনো কিছু বেয়াদবী দেখলে হয়ত হাতে মাথা কেটে নেবে!

মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি হল ঘর। সেইখানেই এসে সব যাত্রী জমায়েৎ হল—আর এদিক-সেদিক বেরিয়ে বেড়াতে লাগলো। এক কোনে একটি ছোট্ট ঘর। কাচের জানালা দিয়ে দেখা গেল—সেখানে ফোন করবার ব্যবস্থা আছে। একটি লোক আপাদ-মস্তক কম্বলে ঢেকে দিব্যি ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। এই যে এতগুলি প্রাণী চলা ফেরা করছে, হাসি-ঠাট্টা-তামাসা চালিয়েছে—সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই! পৃথিবীর কোনো গোলমালেই তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না!

হলের মধ্যে তুটি তিন-চার বছরের শিশু দিব্যি কলহাস্যে আসর জমিয়ে তুলেছে। একটি শিশু একজন ইন্দোনেশিয়ার মায়ের ছেলে আর একটি কোনো ইউরোপীয় শিশু। পরস্পরের জানা শোনা নেই—দেখা সাক্ষাৎ নেই। এই বিমানেই মিলন—আর বাগদাদের নিশুতি রাত্রে তাদের আনন্দ-আসর। হয়ত এর পর আর জীবনে দেখা হবে না। কিন্তু আবার যদি কোনো দিন সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ বাঁধে—তবে কে বল্‌তে পারে—এই তুটি শিশু একদিন যুবক হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়বে না! কিন্তু নিশুতি রাত্রের এই শিশু তুটির কলহাস্য আর ছুটোছুটি কেবলি কি এই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে না—যে মানুষ—আসলে মানুষ? সে যে জাতেরই হোক না কেন! সবাইকার সঙ্গে যেন একটা অদেখা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। বিমানে উঠে বিভিন্ন জাতের মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়াতে একথা আরো বেশী করে মনের কোনে জাগতে থাকে। হঠাৎ দেখা গেল আর একটি ঘরে একটি ভদ্রলোক খটাখট্ করে টাইপ করে যাচ্ছেন। মনে ভাবলাম—এঁর কাছে চিঠি-লিখবার কাগজ, খাম ইত্যাদি থাক্‌তে পারে। সরাসরি জানালার কাছে গিয়ে জান্‌তে চাইলাম। তিনি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লেন, চিঠি

লেখবার ব্যবস্থা অবশ্যই আছে—কিন্তু আপনাদের দশ মিনিটের মধ্যেই প্লেনে গিয়ে উঠতে হবে। চিঠি লিখবার সময় আর কোথায় ?

খবর শুনে আর আপত্তি করা চল্‌লো না।

খানিক বাদেই অবশ্য আহ্বান এলো আবার আকাশচারী হবার জন্যে। সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে হাত দুটো বুকে গুঁজে কোনো রকমে আমরা সবাই ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে বিমানে উঠে নিজের নিজের জায়গা করে নিলাম।

ইতিমধ্যে প্রত্যেকেরই মুখ চেনা হয়ে গেছে। একটা আত্মীয়তা বোধও জেগেছে সবাইকার মনে।

এবার বোগদাদ থেকে ডাচ বিমানের সব কর্ম্মচারী বদ্‌লি হয়ে এলো। পরিচারক, পরিচারিকা—মায় ক্যাপ্টেন অবধি। সবাই যেন আরো ফিট্‌ফাট্‌ সুন্দর, কায়দা-দোরস্ত পোষাক পরে এসেছে। এদের আরো সুদর্শন বলা চলে।

অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাকি রাতটা ঘুমুবার জন্যে দেহ এলিয়ে দিলেন। প্রত্যেক আসনের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা আছে যে সেটা ওপরের দিকে একটু টিপে দিলেই—ইজি চেয়ারের আরামদায়ক আকার ধারণ করে। তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়ানি মাসি-পিশির আরাধনা করতে ভালো লাগে। ওদিকে একটি ইন্দোনেশিয়ান মহিলা খুব সৌখীন পোষাক পরে—মুখে রঙ লাগিয়ে এসেছেন। তিনি বিশেষ একটি ভঙ্গী নিয়ে ঘুমের আরাধনা সুরু করে দিলেন।

সম্প্রতি আর দুটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এঁরা দুজনেই কল্‌কাতার মোটা মাইনের চাকুরে। একজন বার্ড কোম্পানীতে চাকরী করেন বল্লেন। ছ'মাসের ছুটি নিয়ে

হোম্—মানে—লণ্ডনে চলেছেন। আগামী কাল সন্ধ্যে বেলা এঁরা দুজন লণ্ডনে পৌঁছুবেন। নিজেরাই যেচে এসে আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন। আমারও বেশ ভাল লাগলো তাঁদের সঙ্গে নানা কথা বলে। কিন্তু যদি কল্‌কাতা সহর হত তবে এঁরা বোধ করি আমার মতো নেটিভের সঙ্গে কথা বল্‌তেই চাইতেন না। ভারত থেকে বাইরে এসে বিমান যাত্রার শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা একেবারে উঠে গেছে।—কেউ আর হরিজন নয়,—সব একাকার হয়ে গেছে।

বিমানে এসে আমি কিন্তু সরাসরি কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলাম না। খাতাখানি খুলে আমার আসনের ওপরকার ছোট আলোটি জ্বেলে এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বস্‌লাম।

পাশেই বিমানের চাকার একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে—পায়ের নীচে বোগদাদ সহর দীপালীর আলোর মালার মতো খানিকক্ষণ ঝিকিমিকি করে—আস্তে আস্তে আলেয়ার মতো দূরে মিলিয়ে গেল।

আমি জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখ্‌ছি—আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো লিখে চলেছি।

শেষ রাত্তিরের আলো-আঁধারীর মধ্যে লিখতে ভারী ভালো লাগছে। সবাই যখন ঘুমুচ্ছে—আমি তখন একা জেগে ছোট্ট আলোটি জ্বেলে পাতার পর পাতা প্রলাপ রচনা করে চলেছি—এই ভাবটি আমার নিজের কাছে খুব উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

লিখতে বসে কলমটাকে নিয়ে কিন্তু ভারী বিপদে পড়েছি। মাঝে মাঝেই কালীর স্রোত বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। হাত আর মন যখন ক্রমাগত রচনা করে যেতে চাইছে—লেখনি কেবলি পদে পদে বাধার সৃষ্টি করছে—দ্রুতবেগে এগুতে দিচ্ছে না।

অনেকক্ষণ ধরে কলমটা ঝেঁকে নিয়ে তবে আবার তুলাইন লিখতে পারছি। হয়ত যে কথাটা মনের কোনে উঁকি মারছে—লেখনী তা খাতার পাতায় ধরে রাখতে পারছে না।

এইভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলেছে আমার রচনা! তু পা এগোয় ত' চার পা পিছিয়ে আসে।

আরো খানিকটা লেখবার পর ভারী ঘুম পেলো।

তখন খাতাই পাতা দিলাম গুটিয়ে, লেখনি করলাম বন্ধ, তার পর কম্বলটা টেনে—আসনটাকে ইজি চেয়ারের মতো করে দিলাম লম্বা ঘুম।

হঠাৎ বিমানের ঘোষণায় ঘুম ভেঙে গেল।

বিমান থেকেই জানানো হলো যে, বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি দেখা যাচ্ছে, যাত্রীরা যেন সবাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নেন।

লাফিয়ে উঠ্লো সবাই সঙ্গে সঙ্গে। যে বিসুভিয়াসের গল্প ছেলেবেলা থেকে সবাই পড়েছে—ছবি দেখেছে "লাষ্ট ডেজ্ অফ্ পম্পিয়াই"···সেই বিসুভিয়াস কি না দেখে থাকা চলে? আমার মতো যাঁদের আসন একেবারে জানালার ধারে তারা বসে বসেই দেখ্তে লাগলেন, আর যাঁরা ভেতরের দিকের আসনে বসেছিলেন—তারাও সহযাত্রীদের কাঁধের ওপর দিয়ে উকিঝুঁকি মারতে লাগ্লেন কিম্বা লাজ লজ্জার বালাই ছেড়ে দিয়ে একেবারে হুম্ড়ি খেয়ে পড়লেন। বিসুভিয়াস ত আর অগ্নি উদ্গার করছে না। কাজেই অন্যান্য পাহাড় থেকে তাকে আর আলাদা করে চেনা যাবে কি ভাবে? তুরন্ত ছেলে বিসুভিয়াস এখন ঘুমিয়ে আছে। শিব ঠাকুর হচ্ছেন শান্ত···সদাশিব। মাটি দিয়ে যেমন খুশী গড়ো আর বেলপাতা দিয়ে পূজো করো, ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু সেই সদাশিব যখন সংহার-মুর্ত্তিতে পৃথিবী ধ্বংস করতে প্রলয় নাচন—

নাচ্‌তে সুরু করেন তখনই তিনি হন নটরাজ। মানুষ নটরাজ মুর্ত্তিকে ভয়ের সঙ্গে ভালোবাসে। বিস্থুভিয়াস ধ্বংসের অবতার বলেই লোকে দারুণ ভীতির সঙ্গে তার নাম স্মরণে রাখে। সুতরাং তার সেই চরম মূর্ত্তি না দেখ্‌লে মনে ধরবে কেন? জানিনা, কবে আবার এই দামাল ছেলে বিস্থুভিয়াস কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করে হঠাৎ জগৎবাসীকে ডেকে বল্‌বে—"ময়-ভূঁখা হুঁ!"

বিস্থুভিয়াস যদি না মনের খোরাক জোটাতে পারল—প্রাণ ভরে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে দিল—নীচের তরঙ্গ সঙ্কুল নীল বারি রাশি। আমাদের ঠিক তলায় ভূমধ্যসাগর আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাগরের স্বচ্ছ নীল জল আর তার ভেতর ছোট ছোট দ্বীপগুলি এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, সেদিক থেকে চোখ ফেরানো সহজ নয়। তীরের যে সব অংশ জল রাশি ভেদ করে সাগরের মধ্যে ঢুকে গেছে সেই আঁকা-বাঁকা দাগগুলি এত উঁচু থেকে অবিকল ছবিতে আঁকা ম্যাপের মত দেখাচ্ছিল।

ভূমধ্য সাগরের খোলা হাওয়া আমাদের দেহ আর মনকে একেবারে উন্মুক্ত করে দিল।

এর পর সেই মধুর পরিবেশে কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক বুঝ্‌তেও পারিনি। ঘুম পাড়ানি মাসি পিশির গান গাওয়া ছড়া শুনে যেন আপনিই চোখের পাতা মুদে এসেছিল।

হঠাৎ একটা স্নিগ্ধ আলোতে তাকিয়ে দেখি—সূর্য্যোদয় হয়ে গেছে—; রবির সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে নীল আকাশের দিক-বিদিকে—, সেই সোনালী আলো প্রতিফলিত হচ্ছে নীচে ভূমধ্যসাগরের নীল জলে। এখন আবার ছবির রূপ সম্পূর্ণরূপে পাল্‌টে গেল। মনে হল কোন অদেখা পটুয়া যেন বিরাট ক্যান্‌ভাসে তার মায়া তুলি দিয়ে তেল-রঙে একটি বিচিত্র ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

ইতিমধ্যে বিমান বালিকাদেব মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেছে। রোমে আস্‌বার বহু আগেই যাত্রীদের প্রাতরাশ (Break fast) শেষ করে দিতে হবে। তার পর তারা গুছিয়ে নেবার সময় পাবেন।

কে, এল, এম কোম্পানীকে প্রশংসা করতেই হবে। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এখানে একেবারে রাজসিক ব্যবস্থা। কোনো রকম ত্রুটি এরা রাখ্‌তে দেন না। এই বিমানে যাত্রীদের জন্যে মদের খরচই অঢেল। কিন্তু স্বপনবুড়োর ও বালাই নেই। কাজেই আমি কফি, চকোলেট, কমলালেবু, আপেল ইত্যাদি দিব্যি খেতাম। বাক্স-বাক্স দামী চকোলেট এরা যাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে। আমি নিজে এত চকলেট পেয়েছিলাম যে, খেতে না পেরে বাক্স শুদ্ধ বিমানেই ফেলে আস্‌তে হয়েছিল। তখন দেশের ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়েছিল বার বার। আমি বুড়ো মানুষ আর কত চকোলেট খেতে পারি? ছোটরা হাতে পেলে আনন্দ করে খেতো।

কাজেই কে, এল, এম বিমানে প্রাতরাশ যে ভালোভাবেই সম্পন্ন হল—সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে বিমান থেকে ঘোষণা এলো যে, রোমের যাত্রীরা তৈরী হয়ে নিন। আমার বিশেষ গোছাবার কিছু ছিল না। একটা স্যুটকেশ ত কে, এল, এম কোম্পানীই উপহার দিয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই বিমান প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক যাত্রীকে একটি করে স্যুটকেশ উপহার দিয়ে থাকে। সেই স্যুটকেশে ভর্ত্তী ছিল আমার প্যাণ্ট সার্ট জামা ধুতি ইত্যাদি। আর একটি ছিল এ্যাটাচিকেস। তাতে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, জামবাক্‌, টুথ পাউডার, তোয়ালে, ব্রাশ, মাথার তেল ইত্যাদি টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিষ। আর

সঙ্গে ছিল আসরের ছেলেমেয়েদের দেয়া ওদেশের ছোটদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অভিনন্দন পত্র, রাখি, পুতুল ইত্যাদি।

আমাদের সব পেয়েছির আসরের সংগঠনী আর ইংরেজীতে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পত্রিকাও কিছু আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বিতরণ করবার জন্যে।

সুতরাং আলাদা করে গুছিয়ে নেবার আমার কিছুই ছিল না।

আমার ইউরোপে আস্‌বার পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা এই অবকাশে বলে নি। শেষ মুহূর্ত্তে আমার পাসপোর্ট মিল্‌লো। সেইজন্য এত তাড়াতাড়ি রওনা হতে হল যে, নতুন করে কোনো পোষাক তৈরী করবার সময়ই ছিল না। তা ছাড়া সব কিছুই অতি ব্যয় সাপেক্ষ। পোষাকের সমস্যার সমাধান আমি অতি সহজেই করে ফেলেছিলাম। যে দিন যাওয়া ঠিক হল সেই দিন সন্ধ্যাবেলা আমার বহুকালের বন্ধু রূপবাণীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীসুধীর গুপ্তের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল্লাম। তার ছুটি দামী গরম সুট ছিল: তিনি এক কথাতেই সেগুলি বের করে নিয়ে এলেন এবং তাঁর বৈঠকখানায় পরীক্ষা মূলক ভাবে পোষাকগুলি পরে দেখা হল। তিনিও আমার মতো খাটো মানুষ। চমৎকার 'ফিট্' করে গেল পোষাকগুলি। কে দেখে বল্‌বে যে এগুলি আমার জন্য বিশেষ করে তৈরী হয় নি! সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে তিনি বল্লেন, O. K.

গুপ্তর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘকালের। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন গাঢ় ও প্রীতি এত গভীর যে ধন্যবাদের প্রয়োজন করে না! তিনি নিজেই প্যাক্ করে দিলেন পোষাকগুলি। বোগল দাবা করে বাড়ী নিয়ে এলাম। এবার প্রশ্ন জাগ্‌ল—সার্টের। আমি নিজে সার্ট কোনো কালেই পরি না। ধুতি পাঞ্জাবী আমার চিরকালের

পোষাক। কিন্তু যাচ্ছি শীতের দেশে। ধুতি পাঞ্জাবী সেখানে চল্‌বে না—এই কথাই বন্ধুরা বলে দিলেন। অদ্ভুতভাবে আমার গায়ের মাপের সার্টও পাওয়া গেল। এম, পি প্রডাকসন্সের হারু দা—আমার সাম্‌নের বাড়ীতে থাকেন,—আমার ঘনিষ্ঠতম কল্যানকামী প্রতিবেশী,—তার ছেলে সেলু। সেলুর সার্টগুলি চমৎকার আমার গায়ে মানান সই হয়ে গেল। মনে হল যেন আমারই জন্যে দর্জ্জি মাপ নিয়েছিল। গায়ে কিছুমাত্র বেমানান দেখালো না। সেলুও খুব খুশী—তার সার্টগুলি ইউরোপ বেরিয়ে আস্‌বে শুনে! শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র সমস্যা ছিল জুতো। সুধীর গুপ্তের পরামর্শে এক জোড়া আমেরিকান অ্যালবার্ট কিনে নিলাম। এই ভাবে আমি রাতারাতি পোষাকের সমস্যা সমাধান করি। আমার কত বন্ধু ইংলণ্ডে পড়তে গিয়েছে—তারা জামা পোষাকের জন্যে যে ভাবে দু হাতে খরচ করেছে এবং বহু আগে থেকে যে রকম ছুটোছুটি করেছে—দেখে হক্‌চকিয়ে গেছি! কিন্তু আমার ইউরোপ যাত্রার পোষাক সংগ্রহ করতে এক বেলার বেশী সময় পাই নি!

এবার বিদায় নেবার পালা।

বিমানের যাত্রা সাঙ্গ হতে চল্লো। এরই মধ্যে অনেকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে গিয়েছে,—তাঁদের ঠিকানা আমি নিয়েছি, আমার ঠিকানা তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। প্রাণ খুলে আলাপ করেছি আমরা পরস্পর। বিশ্বের রাজপথের যাত্রী আমরা। সবাই যেন সবাইকার নিকটতম আত্মীয় হয়ে পড়েছিলাম—এই চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর।

কথা আছে সকাল ৯টায় আমরা ইটালীর রাজধানী রোমে উপস্থিত হবো।

বিমান-বালিকা এসে জানিয়ে গেল যে, আমাকে আগে নাম্‌তে হবে। কারণ কাষ্টম অফিসের ব্যাপারে অনেক ঝামেলা শেষ করা দরকার। রোমে নামবার যাত্রীর সংখ্যা খুব কম। অনেকেই সোজা লণ্ডন যাচ্ছেন।

আবার সেই লাল অক্ষরের সাবধান-বাণী জ্বলে উঠ্‌ল—Dont smoke fasten belts. আমরাও সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বেল্ট্ লাগিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। বিমান বাজপাখীর মতো দ্রুতবেগে নীচে নেমে আস্‌ছে। গোটা রোম শহরটি বিমানের ওপর থেকে ভারী মজার দেখায়। ছেলেরা যেমন তাদের প্রদর্শনীতে খেলাঘর তৈরী করে ঠিক সেই রকম। মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ···তার ফাঁকে ফাঁকে দালান কোঠা—চওড়া রাস্তা—চার্চ্চ ইত্যাদি চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ল। তারপর বিমান নেমে এলো রোমের বিমান-ঘাঁটির বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে (Run way)। বিমান ঘাঁটির বিরাট উঠোনকে Run way বলে। আমরা তিনটি যাত্রী আগে নেমে গেলাম। তারপর অন্যান্য যাত্রী রওনা হয়ে গেলেন—বিশ্রাম কক্ষে। রোমে নামবার আগে বিমানের বাথরুমে গিয়ে চমৎকার করে দাড়ি কামিয়ে নিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার বেশ ব্যবস্থা আছে। বিমানের ভেতর পায়খানার ব্যবস্থাটিও ভাল।

মাল পত্রের যে রসিদ ছিল তাড়াতাড়ি বের করে কে, এল, এম বিমানের লোকের হাতে দিলাম। অন্য লোকের মালপত্র সব এসে গেল—কিন্তু আমার সুট্‌কেস আর আসে না।

ব্যাপার দেখে চক্ষু ত' চড়ক গাছ!

সুটকেস যদি হারিয়ে থাকে তবে ত' বিদেশ-বিভূঁই এ এসে একেবারে ব্যোম্ ভোলা—দিগম্বর সেজে বেড়াতে হবে! অত দুঃখেও রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন মনে পড়ল—

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়"

ওদিকে কে,-এল-এম বাস বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অপর আরোহীরা মালপত্র নিয়ে বাসে উঠে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আমি না গেলে বাস ছাড়তে পারছে না। এখান থেকে আমরা যাবো রোম শহরের ভেতর কে, এল, এমের সিটি অফিসে।

এক যাত্রী-দম্পতি মনে মনে আমায় গাল দিচ্ছিলেন কিনা তাঁরাই ভালো বল্‌তে পারেন—কিন্তু আমি তখন তেত্রিশ কোটিরও যদি ডবল হয় ত' ছেষট্টি কোটি দেবতার নাম জপ করছি।

আমার প্রার্থনা বুঝি ভগবানের দরবারে গিয়ে পৌঁছুল! দেখি কে, এল, এমের সেই লোকটি সুটকেস হাতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার দিকে আস্‌ছে।

যাক্, এতক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। হৃষ্ট মনে উঠ্‌লাম গিয়ে বাসে।

বাস দ্রুতবেগে এগিয়ে চল্লো—রোম শহরের উদ্দেশ্যে। রোম শহরের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও পৃথিবী বিখ্যাত। সভ্যতায়, স্থাপত্য-শিল্পে, জ্ঞানে, গরীমায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে রোম শহর একদা মানব সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল। প্রচলিত প্রবাদ আছে—"Rome was not built in a day." রোম শহর তৈরী সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প শোনা যায়। বহুকাল আগে এইখানে দুই ভাই ছিল—তাদের নাম হচ্ছে রেমো আর রোমোলো। তাদের মা জন্মের পরই দুই জনকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে কোথায় পালিয়ে যায়। একটি নেক্‌ড়ে বাঘ (Wolf) রেমো আর রোমোলোকে পালন করে বড় করে তোলে। বড় হয়ে দুই ভাই পরিকল্পনা করলে যে এইখানে একটি বড় শহর গড়ে তুল্‌তে হবে। কে শহরটি গড়বার

দায়িত্ব নেবে এই নিয়ে দুই জনের মধ্যে দারুণ ঝগড়ার সৃষ্টি হল। প্রথমে মুখের কথা—তারপর মারামারি। সেই দ্বন্দ্বে রেমো মারা যায়। পরে রোমোলো রোম শহর তৈরী করে এবং তার নামানুসারেই শহরের নামকরণ হয়—"রোম।"

বাস দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে আর সেই সঙ্গে আমার চোখ দুটি সার্চ্চ লাইটের মতো—চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে সব কিছু দেখে নেবার চেষ্টা করছে। বিগত যুদ্ধের বোমা বর্ষণের সাক্ষ্য এখনো রোম শহরের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তবু বল্‌তে হবে রোম বিরাট—রোম অভিনব—রোমের তুলনা শুধু রোম।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পর্য্যটকদল আজও এখানে এসে তার শিল্পকলা আর স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম রোম শহরের ওপর দিয়ে কিন্তু মনে ছিল—ভাবনা-চিন্তার একটা বিরাট আলোড়ন। এখানে সময় অত্যন্ত কম। কাউকে চিনি না। রাস্তাঘাট সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। তবু খুব তাড়াতাড়ি অষ্ট্রিয়া দেশের 'ভিসা' সংগ্রহ করে রাত্রের ট্রেনেই ভিয়েনা রওনা হতে হবে। আবার কল্‌কাতা থেকে শুনে এসেছিলাম যে, অষ্ট্রিয়া এম্‌ব্যাসী দুপুর বেলাতেই বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং ঝড়ের বেগে কাজ করলে যদি কৃতকার্য্য হওয়া যায়। যুগান্তরের শ্রীরবীন্দ্র রায় চৌধুরী আমায় বলে দিয়েছিলেন বিমান থেকে নেমে—খাওয়া দাওয়ার দিকে কোনো দৃষ্টি না দিয়ে আগে অষ্ট্রিয়ার ভিসা সংগ্রহ করবেন। যদি পেয়ে যান ত' নিজের ভাগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন।

কাজেই মনে ভয় ছিল যথেষ্ট।

আমার সম্বলের মধ্যে ছিল কল্‌কাতার এক বন্ধুর লেখা চিঠি—

রোমের এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে! তাঁকে যদি পাওয়া যায় ভালো। নইলে যাকে বলে একেবারে অথৈ জলে পড়তে হবে!

তখন কোথায় অষ্ট্রিয়া-এম্‌ব্যাসী আর কোথায় আমি। আরো একটি বিপদের কথা যে, রোম শহরে ইংরেজী ভাষা একেবারে অচল। এখানে ফ্রেঞ্চ অথবা জার্ম্মাণ ভাষা বেশী চলে।

সব কিছু জড়িয়ে শঙ্কার কারণ ছিল বৈকি।

কে, এল, এম বিমান প্রতিষ্ঠানের সিটি অফিসে পৌঁছে প্রথমেই খোঁজ নিলাম ইংরেজী বল্‌তে পারেন—এমন কোনো অফিসার আছেন কিনা। জানা গেল—ভাঙা ইংরেজী বল্‌তে পারেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে কল্‌কাতা থেকে আনা চিঠি দেখিয়ে অনুরোধ করলাম সেই ভদ্রলোকের অফিসে একটি ফোন করে দিতে। তিনি যেন দয়া করে এসে আমার সঙ্গে কে, এল, এম সিটি অফিসে সাক্ষাৎ করেন। ফোন করার পর ভদ্রলোক আমায় জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এক্ষুণি আসছেন—আমায় অপেক্ষা করতে বল্লেন।

নতুন করে উৎসাহ বোধ করলাম। অকুল সমুদ্রে যেন এক-খানি তরণী খুঁজে পাওয়া গেল! ভদ্রলোক যখন আস্‌ছেন—তখন একটা ব্যবস্থা হবেই।

খুব অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই একখানি গাড়ী নিয়ে ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। তিনি আমার মালপত্র ঐ অফিসে জমা রেখে তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌তে অনুরোধ করলেন। কথা বার্ত্তা গাড়ীতেই হবে। ভদ্রলোক তাঁর অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত আছেন। যেতে যেতে আমার প্রয়োজনের কথা তাঁকে সব খুলে বল্লাম। তিনি উত্তর করলেন যে, কাজের চাপে তাঁর পক্ষে আমার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার এম্‌ব্যাসীতে যাওয়া সম্ভবপর হবে না—তবে তিনি অফিসে এসে তার পরিচিত আর একজন মেয়েকে ফোন

করে ডাক্‌বেন—তিনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, মেয়েটি কিন্তু আদৌ ইংরাজী জানেন না—ফ্রেঞ্চ তার মাতৃভাষা। কি করে আমি তাঁর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা চালাবো সেই হল আর এক সমস্যার ব্যাপার।

যাই হোক ভদ্রলোক তাঁর অফিসে এসে মেয়েটিকে ফোন করে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর এই মেয়েটি এসে হাজির হল। এঁদের একটি মহিলা কাগজ আছে এবং তাঁরা সমাজ সংগঠনের কাজ করে থাকেন। মেয়েটি ভদ্রলোকের কাছে সব কিছু জেনে নিয়ে আমাকে নিয়ে রওনা হলো। যদিও আমরা পরস্পর কথা বল্‌তে পারছি না তবু পথ চল্‌তে চল্‌তে আমাদের ইঙ্গিতে আলাপ চল্‌তে লাগ্‌লো।

সেই যে রামায়ণে পড়েছিলাম—

রাম নাড়ে হাত
আর বানর নাড়ে মাথা
কেউ না বুঝিতে পারে
নর-বানরের কথা ॥

—আমাদের অবস্থাও হল অনেকটা তাই! আমি ইংরেজীতে কথা জিজ্ঞেস করি—আর মেয়েটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমার কথার জবাব দেয়।

এই ভাবে কিছুটা পথ চলবার পর সে একটি ট্যাক্সির সন্ধান পেলে এবং একরকম জোর করেই আমার হাত ধরে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। আমি শুধু তাঁকে জানিয়ে দিলাম—অষ্ট্রিয়ান এম্‌ব্যাসী।

এইবার একটা সুবিধে এই হল যে, আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার কাজ চলা গোছ ইংরেজী বলতে পারে। এখন থেকে সেই আমাদের দোভাষী রূপে কাজ চালাতে লাগ্‌লো।

মেয়েটি বল্লে, আমি তোমাকে অষ্ট্রিয়ান এম্ব্যাসী অফিসের সাম্‌নে নামিয়ে দেবো—তুমি সোজা ওপরে উঠে যাও। ওপরের তলায় অফিস। সেখানে যে অষ্ট্রিয়ান মহিলা আছেন তিনি ভালো ইংরেজী জানেন। কাজেই তোমার আর কোনো অসুবিধা হবে না।

এইবার আমি আবার মনে জোর পেলাম।

ইংরেজী বলতে পারেন এমন কোনো মানুষ পেলে আমি আর কোনো কিছু ভাবি নে।

কিন্তু ওপরে উঠ্‌ছি ত' উঠ্‌ছিই। তালা কি আর শেষ হবে না ? ক' তালা বাড়ী কে জানে ! পা দুটো যেন ভেঙে আস্‌তে লাগ্‌লো। তাই বলে হতাশ হলে চল্‌বে না।

সবশেষে পাওয়া গেল—অষ্ট্রিয়ান এমব্যাসী। আগেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—পার্লে ভু আংলে ? মানে, ইংরেজী বল্‌তে পারো ?

যে মহিলাটি সাম্‌নে বসে ছিলেন—তিনি দূরের একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি আর ইতস্তত না করে সটান সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

দুই তিনটি মহিলা ঘরে বসে লেখা পড়ার কাজ করছিলেন। যিনি মাঝখানের চেয়ারে ছিলেন তার বয়েসটা বেশ বেশী। কাজেই আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে ইংরেজীতে কথা বল্‌তে সুরু করলাম।

আমার জবাবে যখন তিনি ইংরেজীতেই কথা বলা সুরু করলেন তখন যেন আমার প্রাণে দখিনা সমীরণ বইতে লাগ্‌লো। ইংরেজী কথা যে এত মিষ্টি তা কি আগে বুঝ্‌তে পেরেছি !

যাই হোক অতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি ভারতবর্ষ থেকে আস্‌ছি, আজই আমার ভিয়েনাতে রওনা হওয়া প্রয়োজন। কাজেই ভিসা করে দিতে হবে। ওখানকার ঘড়িতে সেই সময় সাড়ে বারোটা বাজে। এক্ষুণি অফিস বন্ধ হয়ে যাবে।

ভদ্রমহিলা আমায় আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, আপনি একটু সাম্নের বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে বস্থন। আমি কতকগুলি দরকারী কাগজ পত্র নিয়ে আস্ছি। সেগুলি ভর্ত্তী করে দিলেই এক্ষুণি আপনি 'ভিসা' পেয়ে যাবেন। কোনো চিন্তা নেই।

বুঝ্লাম, মরুভূমির মাঝখানেই মরুদ্যান পাওয়া যায়। হৃষ্টচিত্তে গিয়ে বারান্দায় দেহ এলিয়ে দিলাম।

তা হলে আজ ভিয়েনা রওনা হতে পারবো! আমার জন্যে নীচে যে মেয়েটি অপেক্ষা করছিল—তার জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছিল। অকারণ তাঁকে আমি কষ্ট দিচ্ছি। তা ছাড়া এই এত গুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠাও তার পক্ষে আরও মুস্কিল ছিল।

যাই হোক বেশীক্ষণ ভাববার অবকাশ না দিয়ে বৃদ্ধ মহিলাটি কতকগুলি কাগজ-পত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন এবং বল্লেন, আপনি এগুলি ভর্ত্তী (fill up) করুন। যে গুলো নিজে বুঝ্তে না পারবেন আমি এসে ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি কয়েক মিনিট বাদেই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হল ?

আমিও হাত চালিয়ে কাজ গুছিয়ে ফেলেছি। কাগজ-পত্র গুলি ওঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুক্লেন। ভিসা পেতে আর মিনিট পাঁচেকের বেশী দেরী হল না। এত শীগ্গির যে কার্যোদ্ধার হবে তা' আমি বুঝতে পারিনি।

বৃদ্ধা মহিলাটিকে ধন্যবাদ দিয়ে দ্রুতবেগে সিঁড়ি গুলি টপ্কে টপ্কে নীচে নেমে এলাম। দেখি মেয়েটি ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে, কাজ সমাধা হয়েছে কিনা? আমি মাথা নাড়তেই সে এক গাল হেসে ফেল্লে, তারপর আমার হাত ধরে আবার গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠ্লো।

ট্যাক্সি ওয়ালাকে সে কি বল্লে আমি বুঝ্‌তে পারলাম না।

আরো খানিকক্ষণ চল্‌বার পর দেখি ট্যাক্সি রেলওয়ে ষ্টেষণে এসে হাজির হয়েছে।

এইবার ভিয়েনার টিকিট কেনার পালা।

আমার সঙ্গে Traveller's চেক্‌ ছিল। কল্‌কাতার টমাস্‌ কুক্‌ কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। রোম থেকে ভিয়েনার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে দিলে মেয়েটি আর সেই সঙ্গে "আন্তর্জাতিক শিশু রক্ষা সম্মেলনের" সম্পাদিকাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলে যে, ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে আমি আজ রাত্রের গাড়ীতে রোম থেকে রওনা হচ্ছি। ট্রেনের টিকিটের দাম লাগ্‌লো—দশ হাজার ছয় শ ষাট লীরা।

ষ্টেষণ থেকে বেরুবার সময় ভিচিয়া মৃদু হেসে বল্লে, তোমার অতি দরকারী কাজ গুলি ত' একরকম শেষ করা গেল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে? চলো, একটি রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক্‌।

কোনো কথা বল্‌বার অবকাশ না দিয়ে সে একরকম জোর করেই আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠ্‌ল। প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উচ্ছল এই মেয়েটির কার্য্যকলাপ দেখে আমি একেবারে থ' বনে গেলাম। আমাকে একেবারে বিদেশী-শিশু মনে করেছে নাকি? খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা একটা রেস্তোরাঁয় এসে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে ট্যাক্সি চালক তার পরিচিত একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জেদ করছিল, কিন্তু আমার সাংবাদিক-বন্ধু ডেলা ভিচিয়া তার কথায় বিন্দুমাত্র কান দেয় নি—সোজাসুজি নিজের জানা একটি রেস্তোরাঁয় চলে এলো।

সেখানে রেস্তোরাঁর মালিককে আমায় খাবার দিতে নির্দ্দেশ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জানালে যে, একটি জরুরী কাজ সেরে সে

এক্ষুণি ফিরে আস্‌ছে। আমি ট্যাক্সি ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু ডেলা ভিচিয়া মৃদু হেসে জবাব দিলে, ট্যাক্সিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি যে—

তারপর পলক ফেল্‌তে দেখি সে প্রস্থান করেছে! আপন মনে বসে লাঞ্চ খাওয়াটা শেষ করলাম। রেস্তোরাঁ-মালিক খুব খাতির করে কি কি জিনিস আমি ভালোবাসি খবর নিয়ে আমায় খাবার সরবরাহ করতে লাগ্‌লো।

বুঝ্‌লাম—এই খাতির সাংবাদিক ডেলা ভিচিয়ারই প্রাপ্য। খাওয়া হয়ে গেলে পাওনা মিটিয়ে দিতে চাইলাম—কিন্তু রেস্তোরাঁর মালিক কিছুতেই আমার কাছ থেকে খাবারের দাম নেবে না।

বুঝ্‌লাম আমার সাংবাদিক বান্ধবীর নির্দ্দেশ আছে। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল ত' মেয়েটিকে নিয়ে। আমার এই তরুণী-অভিভাবিকা কি আমাকে এক কানা কড়িও খরচ করতে দেবে না?

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

ডেলা ঝড়ের মতো এসে ঢুক্‌লো—সোজা ছুটে গেল রেস্তোরাঁর মালিকের কাছে, নিজের মণিব্যাগ খুলে আমার খাবারের পাওনা মিটিয়ে দিতে গেল। আমি একেবারে হা-হা করে পড়লাম। এ তুমি করছ কি?

কিন্তু কার কথা কে শোনে? টাকা মিটিয়ে দিয়ে আমার সুটকেশ হাতে নিয়ে একেবারে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বস্‌ল।

বুঝ্‌লাম প্রতিবাদ করা বৃথা।

শুধু প্রশ্ন করে জান্‌লাম—এইবার আমরা যাবো ওদের কাগজের কার্য্যালয়ে। মহিলা পরিচালিত কাগজ—নাম—"Noi donne"

ওখানে পৌঁছুবামাত্র ডেলা সকলের আগে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে হাঁকিয়ে দিলে। আমার মুখ দেখেই সে

অনুমান করেছিল যে, এইবার আমি একটা গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টায় আছি। ওর কাণ্ড কারখানা দেখে সত্যি আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম! রোমের এই মেয়েটি আতিথেয়তায় সত্যি আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি ত' আর ডেলার অতিথি নই!

ডেলার সঙ্গে ওপরে উঠে দেখি—অনেক মেয়ে এই মহিলা কাগজটির সঙ্গে জড়িত। তারা সবাই আপন আপন কাজ করে চলেছিল। এই কার্য্যালয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ডেলা আলাপ করিয়ে দিলে—তার নাম ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটো। ফ্লোরিয়ানা ইটালীর মেয়ে হলেও চমৎকার ইংরেজী বল্‌তে পারে। অত্যন্ত আলাপী। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে আমার গল্প জমে উঠ্‌ল। ফ্লোরিয়ানা তাদের কাগজের বিশেষ সংখ্যা গুলি এনে আমায় দেখালে এবং একথাও জানালে যে, তাদের একজন প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই 'আন্তর্জাতিক শিশু রক্ষা সম্মেলনে' যোগদানের জন্যে ভিয়েনা রওনা হয়ে গেছে। কথা প্রসঙ্গে ফ্লোরিয়ানা বল্লে, আমাদের অফিসের একটি ভ্যান আছে,—তুমি যদি রোম শহর দেখ্‌তে চাও তবে আমি তোমাকে নিয়ে এক্ষুণি বেরুতে রাজি আছি।

আমাদের দেশে কথায় বলে,—পাগ্‌লা, ভাত খাবি? না, আঁচাবো কোথায়? আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম! এমন সুযোগ হাতে পেয়ে কে ছাড়ে? তক্ষুণি রাজি হয়ে গেলাম। আমরা "Noi donne" পত্রিকার ভ্যানে চেপে রওনা হলাম—রোম পরিক্রমায়।

বিরাট ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে এই রোম শহরের। কথিত আছে, সাত পাহাড়ের শিখরের ওপর রোম শহর দাঁড়িয়ে আছে। শিল্প-সম্ভারে রোম শহর পরিপূর্ণ। কোনো বিদেশী রোম

শহরে গিয়ে হাজির হলে একেবারে তালকানা হয়ে যায়। কোনটা ছেড়ে কোনটি আগে দেখ্‌বে? এক ঔদরিক ব্রাহ্মণের সাম্‌নে প্রচুর খাদ্য-সম্ভার এনে ধরলে তার যে অবস্থা হয়—বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষেও রোম তেমনি লোভনীয় আর আকর্ষণের স্থান।

সেদিন বিকেলে ফ্লোরিয়ানার সঙ্গে আমি যে যায়গাগুলি দেখ্‌লাম—তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দিচ্ছি :—

(১) সেণ্ট পিটার্স স্কোয়ার—চমৎকার যায়গা। সাম্‌নে বিরাট চত্বর—মাঝে বড় বড় ফোয়ারা সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে ধর্ম্মস্থান, গির্জ্জা। সৌধ-গাত্রে অসংখ্য মূর্ত্তি, স্থাপত্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। দেখ্‌লে শিল্পী-মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। সেণ্ট পিটারের ভেতরে খৃষ্টানরা নিজ নিজ দোষ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করে। নবীন রোমের তরুণ-তরুণীরা অবশ্য গির্জ্জায় বিশ্বাসী নয়। ফ্লোরিয়ানার সঙ্গে আলাপ করেই সেকথা বেশ বুঝ্‌তে পারলাম।

(২) জিয়ানিকোলো (Jianicolo)—রোমের সাতটি পর্ব্বতের অন্যতম। এখানে দাঁড়ালে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর ভাবে চোখে পড়ে।

(৩) গ্যারিবল্ডী ও এ্যানিটার বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তি। ভারতের ছেলে-মেয়েদের কাছে গ্যারীবল্ডী ও এ্যানিটার নাম বিশেষভাবে পরিচিত। আমি নিজেও এ্যানিটার জীবনী 'শিশুসাথী'র পাতায় লিখেছি অনেক দিন আগে। স্থাপত্য-শিল্প হিসেবে মূর্ত্তি দুটি মনে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে।

(৪) গ্যারিবল্ডীর সেনাপতিদের মূর্ত্তি সমূহ—এই স্থানটিও অতি মনোরম এবং মূর্ত্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। তৃণাচ্ছাদিত নির্জ্জন

স্থান অতি চিত্তাকর্ষক এবং মূর্ত্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। এখানকার সবুজ পরিবেশ ও চতুর্দ্দিকের রাস্তাগুলি সত্যি সুন্দর।

(৫) ধর্ম্মের প্রচণ্ড শাসনকালে পোপের অধীনে যে বিরাট প্রাসাদ ও চার্চ্চগুলি ছিল—তার আকার ও সৌন্দর্য্য আপনা থেকেই বিস্ময় জাগিয়ে তোলে।

(৬) Campidojlio—৭টি পাহাড়ের অন্যতম। এখানেও বহু উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি আছে। Costore, Polluce ইত্যাদি। প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক চেতনা এইখানেই প্রথম জাগ্রত হয়। Costantino এখানে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান রাজত্বের সূচনা করেন। তাঁর বিরাট স্মৃতি-তোরণ রয়েছে এইখানে।

(৭) কলোসিয়াল থিয়েটার—প্রাচীন যুগের রোমান সম্রাটরা এইখানে কৃতদাসদের সিংহের মুখে ছেড়ে দিত এবং হাজার হাজার দর্শক নিয়ে বসে পৈশাচিক উল্লাসে উপভোগ করতো—কি ভাবে সেই হতভাগ্য কৃতদাসেরা ক্ষুধার্ত্ত সিংহদের মুখে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়! বর্ত্তমান পৃথিবীর বহু পর্য্যটক এসে স্থানটির ছবি তুলে নিয়ে যায়।

(৮) দান্তের গৃহ—রোম শহরে কবি দান্তে যেখানে বাস করতেন এখনো সে গৃহটি দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ীর সাম্‌নে ফলক দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

(৯) টাসোর বিখ্যাত ওক বৃক্ষ।

(১০) Penteon (প্রাচীন যুগের পেগানদের ধর্ম্ম মন্দির)

(১১) জগদ্বিখ্যাত শিল্পী রাফেলকে এই প্যাণ্টেন টেম্পলে সমাধি দেয়া হয়—

(১২) রোমের একমাত্র নদী—টাইবার

(১৩) জুলিয়াস সিজারের বিরাট মূর্ত্তি—

(১৪) রোমো ও রোমোলো দুটি ভাই একটি নেকড়ের কাছে

মানুষ হয়েছিল বলে প্রতীক হিসেবে একটি wolfকে এখনো খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। বহু ছেলে মেয়ে দেখ্‌তে যায় ও খাঁচার ারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত স্থানগুলি দেখ্‌বার পরও ফ্লোরিয়ানার সঙ্গে গাড়ী করে রোমের ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। যত দেখি আশ যেন আর মেটে না। রোমের আর্ট-গ্যালারী পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু সেখানে যাবার আর সময় ছিল না। কারণ বেলা চারটের মধ্যে আর্ট-গ্যালারী বন্ধ হয়ে যায়। তাই মনে মনে স্থির করে রাখ্‌লাম—ফিরতি পথে সেটি দেখ্‌তে হবে।

ফ্লোরিয়ানা প্রস্তাব করল, চলো, তোমায় ইটালীর সিনেমা দেখিয়ে দিই। কিন্তু দুটি কারণে সম্মত হলাম না। প্রথম, দেখতে গেলে কিছুতেই টিকিটের দাম নিতে চাইবে না—নিজেই দিয়ে দেবে। দ্বিতীয়—সারাদিন ঘুরে ঘুরে শরীরটা সত্যি ক্লান্ত লাগ্‌ছিল। সেই সকাল বেলা বিমান থেকে নামার পর থেকেই যে বিরাম বিহীন অভিযান সুরু করেছি—তার ফাঁকে এতটুকু বিশ্রাম হয়নি!

জবাব দিলাম, ইটালীর সিনেমা দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুশী হতাম, কিন্তু এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

ফ্লোরিয়ানার আদেশে গাড়ী ঘুরে এলো আবার তাদের পত্রিকার কার্য্যালয়ে।

আমাদের সঙ্গে ইটালীর একজন সমাজ সেবী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও রোম দেখার সময় নানারকম ঐতিহাসিক গল্প বলে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

কার্য্যালয়ে বসে মহিলা কাগজটি সম্পর্কে অনেক কিছু খবর শোনা গেল। ফ্লোরিয়ানা আমাদের "সব পেয়েছির আসর" সম্পর্কে

উৎসাহ প্রকাশ করায় আমাদের ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, ব্যায়াম পৌষ-পার্ব্বণ উৎসব প্রভৃতির অনেকগুলি ফটো দেখলাম। ভারতীয় মেয়েদের শাড়ী পরার নমুনা দেখে ফ্লোরিয়ানা খুব কৌতুকবোধ করল এবং বেশ মনোযোগের সঙ্গে ছবিগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় আমার ছিল না। সন্ধ্যের মুখে ভিয়েনাগামী গাড়ীতে গিয়ে স্থান সংগ্রহ করতে হবে। ওখানে খোঁজ নিয়ে জনে্তে পারলাম যে, এই বিশেষ গাড়ীটিতে বেশ ভীড় হয়।

ফ্লোরিয়ানাকে আমাদের আসরের তু একঠি ছবি দেয়া আমার উচিত ছিল। কিন্তু ভিয়েনাতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দেখাতে হবে বলে আমি একটি ছবিও হাত ছাড়া করতে পারলাম না। সেজন্য মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগ্‌লো।

এইবার তুই সাংবাদিক বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। ডেলা ভিচিয়া আর ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটো। অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বল্লাম, তোমাদের তুই বান্ধবীর প্রীতির কথা আমি জীবনে ভুল্‌তে পারবো না। ভারতের ছেলেমেয়েদের কাছে তোমাদের আতিথ্য ও সৌজন্যের কথা জানিয়ে বল্‌বো, ভারতের সঙ্গে ইটালীর মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় হোক।

ওরা কর-মর্দ্দন করে আমায় বিদায় দিলে। ওদের অফিসের ভ্যান আমায় ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেই সমাজ সেবী ভদ্র-লোকটি নিজে হাতে আমার স্যুটকেশ বয়ে ট্রেনে পৌঁছে দিলেন। ওঁদের আন্তরিকতয়ে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। বিদেশীকে ওরা কত সহজে আপনার করে নিতে পারে।

সময়মত ষ্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম বলে—কোনো মতে জায়গা

করে নিতে পারলাম। ফ্লোরিয়ানা সত্যি কথাই বলেছে,—এই ট্রেনটিতে খুব ভীড়। শুধু ইউরোপেই নয়—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভিয়েনা একটি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যকর স্থান। বহু জায়গা থেকে দলে দলে নর-নারী এই সময় ভিয়েনার দিকে ছোটে। অস্ত্র চিকিৎসায়ও ভিয়েনার জগৎ-জোড়া খ্যাতি আছে। আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও বহু ধনী ভিয়েনাতে যায় দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতে।

আমি যে কামরায় স্থান পেয়েছিলাম—সেখানে আমার পাশেই একটি বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ইংরেজী বল্‌তে পারেন কিনা। প্রত্যুত্তরে সম্মতি সূচক মাথা নাড়তে আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। মহিলাটির নানা বই পড়বার খুব আগ্রহ। যৌবনে এই আগ্রহের বশেই তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। সঙ্গে তার দুটি বান্ধবী আছেন। এঁদের নিয়ে তিনি নিজের বাড়ীতে যাচ্ছেন। আমি বিদেশী এবং সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আস্‌ছি শুনে বিশেষ আগ্রহে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগ্‌লেন।

আমরা যে ট্রেনে চলেছি তাকে বেশ সুন্দর ও আরামপ্রদ বলে অভিহিত করা চলে। পাশাপাশি দু' জন করে বস্‌তে পারে। বস্‌বার ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। For Ladies only কথাটা এদেশে একেবারে হাস্যকর! পুরু গদীর ওপর মখমলের মতো আরামপ্রদ আসন, ওপরে সুটকেশ ইত্যাদি রাখ্‌বার বাক্স, ভাঁজকরা টেবিল, তার ওপর খাবার রেখে দিব্যি খাওয়া দাওয়া সম্পন্ন করতে পারা যায়,—কাছাকাছি সুন্দর ও পরিপাটি 'টয়লেট্', কিছুরই অভাব নেই এই ট্রেনে। যাত্রীরা অতি সহজেই পরস্পরের সঙ্গে আলাপ জমাতে উৎসুক। একটু আগ্রহ থাক্‌লেই হল।

বৃদ্ধা অষ্ট্রীয়ান মহিলাটির নাম—ফ্র্যান রোজ হুজের। কিন্তু আমি তাঁকে অষ্ট্রীয়ার মাসিমা বলেই উল্লেখ করবো। কারণ সারাটা রাস্তা তিনি আমাকে মায়ের স্নেহে আগ্‌লে রেখেছেন এবং সকল রকমের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

আমরা এখন ইটালীর গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলেছি। দুধারে যতদূর দৃষ্টি যায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।

হঠাৎ একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই দেখ্‌তে পেলাম—দলে দলে ছেলে-মেয়েরা নেমে খাবার কিনে নিচ্ছে। খাবার ওয়ালাদের ঘিরে বিষম ভীড় লেগে গেছে।

অষ্ট্রিয়ার মাসিমা আমাকে সচেতন করে দিয়ে বল্লেন, বাছা এইখান থেকে রাত্তিরের খাবার কিনে নাও। নইলে পরে বিপদে পড়বে!

আমি জিজ্ঞেস্ করলাম, কি খাবার, কি তার নাম কিছুই ত' জানিনে!

তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, হুঁ! বুঝেছি। আমার হাতে কিছু পয়সা দাও ত! ওভার কোটের পকেটে ছিল—ইটালী দেশের নোট লীরা। কিছু তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে নেমে গেলেন এবং ভীড় ঠেলে খাবার কিনে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলেন। বল্লেন, এইবার ধরো দেখি—

চেয়ে দেখি স্যাণ্ডুইচ, নানারকম কেক আর দিব্যি পুরুষ্ট কলা। খাবারের নমুনা দেখে মন সত্যি উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল। ওদেশের স্যাণ্ডুইচ কিন্তু আমাদের মতো নয়। মোটা পাউরুটি তার মাঝখানে দিব্যি মাংসের স্তর। খেতে সুস্বাদু সে কথা বলাই বাহুল্য। সবাই এই বস্তুটি বেশ আনন্দ করে খাচ্ছে। কলাও খুব মিষ্টি আর মুখ-রোচক। আমাদের দেশের কলার চাইতে আকারে ও ওজনে বড়।

মাসিমার মতো বুড়ী মানুষকে খাটিয়ে নিলাম বলে সত্যি লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মাসিমার মুখ-চোখের ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হল তিনি যেন তাঁর কর্ত্তব্য পালন করলেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে খাবার গুলি গ্রহণ করলাম। তিনি বাকি পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অষ্ট্রিয়ার মাসিমার সঙ্গে আলাপ আরো ঘরোয়া এবং আন্তরিক হয়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম, দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে এই স্নেহশীলা মাসিমার কথা আমি গল্প করবো। তাতে তিনি ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। বোধ করি খুব ভালো লাগ্‌লো কথাটা। কিন্তু পরক্ষণেই গলাটা খাটো করে উত্তর দিলেন, আমার মধ্যে এমন আর কি আছে যে, ঘটা করে গল্প করতে হবে? অতি সাধারণ মানুষ আমি। আমিই বা রসিকতা করতে ছাড়বো কেন? বল্লাম, অতি সাধারণের মধ্যেই ত' অনন্যসাধারণ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের মনটাই হচ্ছে আসল। হয়ত একথা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। তাই চুপ করে রইলেন।

মাসিমার সঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকা ছিল। মাঝে মাঝে তাও দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। অধিকাংশ কাগজই জার্ম্মান ভাষায় ছাপানো। তাই ছবি দেখা ছাড়া—পড়বার আর যো ছিল না।

অষ্ট্রিয়ার মাসিমা তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে আমার নোট বইয়ে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা লিখে দিলেন। আমিও লিখে দিলাম আমার ঠিকানা তার খাতার পাতায়।

ইতিমধ্যে ট্রেনের "রেস্তোরাঁ কারে" যারা নৈশ-ভোজন সমাপন করবেন—তারা নিজ নিজ যায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। যাঁরা অত্যন্ত ভোজন বিলাসী, কিম্বা বড়লোক তাঁদেরকেই কেবলমাত্র

"রেস্তোরাঁ কারে" গিয়ে ডিনার খেতে দেখা গেল। নতুবা অধিকাংশ যাত্রী নিজ নিজ কামরায় বসে সঙ্গে আনা খাবার খেয়েই নৈশ-ভোজন সমাপন করলেন। লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম, এর ভেতর দিয়ে বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠ্‌ল বিভিন্ন যাত্রীর মধ্যে।

গল্প গুজব আর মাঝে মাঝে বই পড়ার ভেতর দিয়ে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এলো। এরই মধ্যে অনেকে ঘুমের আয়োজন করে নিয়েছেন। কেউ কেউ দিব্যি ঘুমিয়েও পড়েছেন।

দুটি ফুট্‌ফুটে চমৎকার সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ আমাদের কামরায় এসে হাজির হল। তাদের চোখে মুখে সরল হাসি আর অনাবিল চঞ্চলতা। কিন্তু দুটি আসন খালি ছিল না আমাদের কামরায়। কাজেই একটি মেয়ে বসবার যায়গা পেলো, আর একজন চলে গেল অন্য ঘরে। তাদের সঙ্গের মাল তারা আমাদের ঘরেই রেখে গেল। দুটি মেয়ের মধ্যে ভারী ভাব। এরাও ভিয়েনা যাবে। একজন এ ঘরে, আর একজন পাশের ঘরে এই ব্যবস্থাটা বোধ করি ওদের আদপেই ভালো লাগ্‌লো না। তাই খানিকক্ষণ বাদে এসে অন্য মেয়েটি এই ঘরের মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেল। সুটকেশ ইত্যাদিও বয়ে নিয়ে গেল নিজেরাই ধরাধরি করে। ইউরোপে একটি জিনিস লক্ষ্য করছি যে, সবাই স্বাবলম্বী। ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক—নিজের মালপত্র নিজেই বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্যে কেউ বড় একটা কুলিকে ডাকে না। মহিলারা পর্য্যন্ত নিজ নিজ জিনিস-পত্র সানন্দে বয়ে নিয়ে চলেছে। গরীব-বড়লোকের বালাই নেই। এই যে স্বাবলম্বনের রীতি—বাইরে থেকে গিয়ে এই ব্যবস্থাটা সত্যি ভালো লাগে এবং সত্যিকারের শিক্ষণীয় বলে মনে হয়। আমাদের দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত কিম্বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সুটকেশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ আমরা কল্পনাও করতে পারিনে। একটু

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা পর্য্যন্ত নিজের সুটকেশ হাতে তুলে নিতে লজ্জা বোধ করে—সেজন্যে ডাক পড়ে কুলির। বিদ্যাসাগরের সেই কুলি সাজার গল্পটি ত' আমাদের দেশে অমর হয়ে আছে!

ইউরোপের যে তিনটি দেশে আমি ঘুরেছি—ইটালী, অষ্ট্রিয়া, আর সুইজারল্যাণ্ড—সর্ব্বত্রই এই স্বাবলম্বী হবার প্রথাই আমার মনকে আকর্ষণ করেছে। নিজের মাল নিজে বইবার জন্যেই প্রত্যেকে খুব কম জিনিস নিয়ে পথে-ঘাটে চলা ফেরা করে। যা নেহাৎ না হলে চল্‌বে না—শুধু সেই সমস্ত জিনিসই সঙ্গে থাকে। বাড়তি বস্তু একটিও না।

অবশ্য ইউরোপ ভ্রমণের একটা প্রকাণ্ড সুবিধে আছে। প্রত্যেক হোটেলেই—বিছানা-পত্তরের এমন সুব্যবস্থা যে, শুধু পরিধেয় পোষাক নিলেই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি মহা আরামে ভ্রমণ করা চলে।

কিন্তু আমাদের দেশে কল্‌কাতা থেকে ঘাটশীলা যেতে হলেই বাক্স, ড্যাক্স, ট্রাঙ্ক, তোষক, সতরঞ্চি, কম্বল, বালিশ, লোটা, থালা, কড়াই, উনুন, ধামা, কুলো সব কিছু গুছিয়ে জবরজঙ্গ সেজে রওনা হতে হবে। এতে ভ্রমণের আনন্দ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। ওদেশে সুটকেশটি নাও আর বেরিয়ে পড়ো। ভোজনং যত্র তত্র—শয়নং হট্ট মন্দিরে অবশ্য নয়—কিন্তু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র এমন পরিপাটি যে, সেজন্য কেউ বিন্দু মাত্র মাথা ঘামায় না। ভালো এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা পাওয়া যাবে—এ ত জানা কথা! শুধু অর্থের তারতম্যে আরামের উনিশ-বিশ। ইউরোপে কোথাও খাদ্যে ভেজাল নেই। কাজেই খাবার খেয়ে অসুখ করবে—একথা কারো মনে জাগে না। মানুষের খাদ্যে যারা ভেজাল মেশায় তারা দেশকে অতি সহজেই রসাতলে পাঠিয়ে দিতে পারে; দেশের এত বড়

শত্রু ইউরোপে খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে ঠক্ বাছ্‌তে গা উজোড়! মরুক না লোক,—বেড়ে যাক্ না শিশু-মৃত্যুর হার···আমি নিজে আটার সঙ্গে পাথর, চালের সঙ্গে কাঁকড় আর আর ছেলেদের দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে পয়সা কামিয়ে নি না! কিসের ভয়? অথচ ধর্ম্ম ও পরকালের অনুশাসন আমাদের দেশেই অধিক! ও দেশে নাস্তিকের সংখ্যা বেশী। কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন এবং আগ্রহশীল। পরশুরামের সেই মজার কথাটা মনে পড়ে—! সেই খাদ্যে ভেজাল মেশানো সম্পর্কে যে কথাটি অমর হয়ে আছে। "পাপ হোবে ত' কাসেম আলির হোবে। হামি না আঁখসে দেখি—না নাকসে শুঁকি!" মানুষের খাদ্য সম্পর্কে ভাবের ঘরে চুরি ইউরোপে কোথায়ও নেই!

হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। মেয়েদের নিজের মাল-পত্তর বয়ে নিয়ে যাওয়া দেখে যে কথাগুলি মনে হচ্ছিল—তাই বলতে গিয়ে একটু দূরে চলে গিয়েছিলেন।

এই স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারটা বিদ্যেসাগর মশাই কত বচ্ছর আগে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—তবু আমাদের চেতনা নেই!

চোখ বুঁজে নিজের দেশের সঙ্গে ওদের কর্ম্মশক্তির তুলনা করছিলাম—আর মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম।

এটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা বটে, রাত্তিরে শুয়ে থাকার কিন্তু ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আবার আলাদা ভাড়া দিয়ে আসন চিহ্নিত করে রাখতে হয়। খুব বড়লোক না হলে সহসা সে ব্যবস্থা কেউ করতে যায় না।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি অনেকেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। অষ্ট্রীয়ায় মাসিমাও গুড়িসুড়ি মেরে তাঁর আর দুই বান্ধবীর

মাঝখানে যায়গা করে নিয়েছেন। আমাদের গাড়ীতে কোনো ছেলে-পেলে ছিল না। থাক্‌লে তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা হত সেটা ভালো করে বলতে পারবো না।

এক একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌ছে, যাত্রীদল উঠে আস্‌ছে কিন্তু কোনো কামরায় স্থান নেই দেখলে আর সেখানে ঢুকে অকারণ ভীড় বাড়াচ্ছে না। ট্রেণটাতে রয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত টানা বারান্দা। যাকে করিডোর বলা হয়। যারা বসবার স্থান পাচ্ছে না—সেই রকম মেয়ে-পুরুষ বিনা দ্বিধায় 'করিডোরে' দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে আস্‌ছে। এ জন্যে মেয়ে কিম্বা পুরুষ কারোই কোনো অভিযোগ নেই। কিম্বা ভেতরের পুরুষরা নিজেরা দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েদেরও জায়গা করে দিচ্ছে না। প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্বে পথের কষ্ট সহ্য করছে—নারী—নারী বলেই কারো কাছ থেকে উপরি সুযোগ-সুবিধে আদায়ের জন্যে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট নয়। আমাদের দেশের ট্রেণগুলিতে 'বিশ জন বসিবেক'-এর জায়গায় যেমন্ প্রয়োজন বোধে ৫০ জনও ঠেলে ঠুলে উঠে কারো ঘাড়ে ট্রাঙ্ক এবং কারো কোলে বিছানা ফেলে দিয়ে যায়গা করে নেয়—এখানে তেমন কোনো হুটো-পুটি কিম্বা 'জবর দখলের' পালা নেই। স্থান ভর্ত্তী হয়ে যাবার পর যে যাত্রী ট্রেণে উঠেছে সে নির্ব্বিবাদে 'করিডোরে' দাঁড়িয়ে যাবে এইটেই স্বাভাবিক চলতি নিয়ম!

এমনও দেখলাম, বহু তরুণ-তরুণী সারারাত করিডোরে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে কিন্তু ভেতরে এসে বস্‌বার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেনি। অথচ রাত্তিরে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। বরফ জমেছে বাইরে।

গাড়ীর মৃদু ঝাকুনিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জান্‌তেও পারিনি। ঘুম পেলে যাত্রীরা নিজেরাই কামরার সবগুলি আলো

একেবারে নিভিয়ে দেয়। তখন একান্ত মনে নিদ্রা দেবীর আরাধনায় আর কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

আমাদেরও কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।

ভোরের স্নিগ্ধ আলো আর ফুরফুরে হাওয়া আল্‌তো করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

তারপরই প্রথম যে বস্তুটির প্রয়োজন সেটা হচ্ছে 'টয়লেট্'। 'বাথরুম' কিম্বা 'ল্যাভেটরী' বল্লে ইউরোপে কেউ বুঝতেই পারবে না। 'টয়লেট্' নামটি সর্ব্বত্র প্রচলিত। মূখ ধোয়া থেকে সুরু করে প্রসাধন পর্যন্ত সমস্ত প্রাতঃকৃত্য ওই একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সম্পন্ন হয় বলেই বোধ করি এই মধুর নামকরণ করা হয়েছে।

অবশ্য আমাদের গাড়ীতে দেখলাম, অনেকেই মুখ না ধুয়েই নিজেদের সঙ্গের খাবার সকালবেলা দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই স্বাস্থ্যকর কিম্বা রুচিসম্মত বলে মনে হল না। কাজেই 'টয়লেটের' সন্ধানে বেরুতে হল।

সেখানে অপ্রত্যাশিত রূপে আলাপ হল ভিয়েনার এক অধ্যাপকের সঙ্গে। তিনি নিজে থেকেই এসে পরিচয় করলেন এবং একথাও আনন্দের সঙ্গে আমাকে জানালেন যে, তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছেন। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন, ভদ্রলোক। এই রকম একটি আলাপী লোকের সন্ধান পেয়ে আমিও বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম।

ভদ্রলোক বল্লেন, আমার অতিথি হিসেবে আর দুটি মেয়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গেও আপনার আলাপ করিয়ে দিই—

দুটি হাস্য-মুখরা মেয়েকে দু'হাত দিয়ে ধরে টান্‌তে টান্‌তে এনে হাজির করলেন প্রফেসর। তাকিয়ে দেখি, কালকে রাত্রে যে দুটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে আমাদের কামরায় প্রথম গিয়েছিল—তারপর স্থান পরিবর্ত্তন করে নিয়েছিল—এরা তারাই।

বল্লাম যে, ওদের দুটিকেই কালরাত্রে আমাদের কামরায় দেখেছি কিন্তু পরিচয় হয় নি।

প্রফেসর খুব আনন্দের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজনের নাম 'রুথ' আর এক জনের নাম 'ফেলিসিটাস্'। দুটি মেয়েই কথায়-বার্তায়, আনন্দে-কৌতুকে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। কিন্তু এরা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসে নি। আমাদের দেশ সম্পর্কে এদের দুজনের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই! আমাদের দেশের মেয়েদের বিষয়ে মজার মজার সব প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন সবপেয়েছির আসরের ফটো-গুলি এনে ওদের দেখালাম। ওরা যেন সাত রাজার ধন মাণিক খুঁজে পেলো। ছবি দেখে প্রশ্নের পরিমাণ আরো গেল বেড়ে। কত প্রশ্নের জবাব দেবো আমি? ওরা বল্লে, ভারতবর্ষ দেখবার ওদের খুব ইচ্ছে। কিন্তু জীবনে হবে কিনা সন্দেহ। প্রফেসরের ইঙ্গিতে মেয়ে দুটি ওদের সঙ্গের ফল বের করে আমায় খেতে দিলে। খেতে খেতে হাসি পরিহাসের ভেতর দিয়ে চল্লো—নানারকম আলোচনা আর গল্প।

ওদের দুজনের ফটো আমাকে উপহার দিলে। আর আমার ঠিকানা লিখে নিলেন প্রফেসর ভদ্রলোক। ভারতের মেয়েদের সাড়ী পরার ধরণ দেখে ওদেশের মেয়েদের কি দারুণ কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। মনে হয় কোনো নামকরা ব্যবসায়ী যদি ওদেশে শাড়ী পরানোর কায়দা মেয়েদের দিয়ে হাতে কলমে চালু করে (Demonostration) নানা ধরণের শাড়ীর কারবার করে তবে বড়লোক হয়ে যেতে বেশী বিলম্ব হবে না!

রুথ আর ফেলিসিটাস্ কিন্তু চুপ করে বসে নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঢেউ আস্‌ছে তাদের কাছ থেকে।

—ভারতবর্ষের নদীগুলি বুঝি খুব বড়ো ? তাজমহল দেখতে কেমন ? ভারতীয় শিল্প আর নৃত্য···বলুন না সে সম্পর্কে কিছু।

হঠাৎ ট্রেন থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখি ইটালীর আলো-ঝলমল পুবাকাশ যেন এক বিদেশী অভিযাত্রীর কাছে তার সোনালী আখরে লেখা আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে দিয়েছে। এতো ভালো লাগলো সকাল বেলাকার ইটালীর অফুরন্ত সৌন্দর্য !

আমার নতুন পাওয়া প্রফেসর বন্ধু, রুথ ও ফেলিসিটাসের কাছ থেকে বিদায় দিয়ে বাইরে টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সত্যি সেই সকাল বেলা মন হরণ করে নিল—ইটালী দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। দূরে দীর্ঘ পাহাড় শ্রেণী—তার শিখরে শিখরে বরফ জমে এক নয়ন বিমোহন শোভার স্থষ্টি করেছে। সাম্‌নে সবুজে ঢাকা ঢেউ খেলানো উঁচু নীচু উপত্যকা। ওদেশের কৃষাণ মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে ক্ষেতের কাজ করতে···কণ্ঠে তাদের স্থমিষ্ট পল্লী সঙ্গীত ! এক কলি কানে আসতেই ট্রেন দ্রুতবেগে তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে স্থরটা যেন আমার কাছে অজান্তে গচ্ছিত রেখে গেল।

মাঝে মাঝে সন্ধান পাওয়া গেল পাহাড় ও উপত্যকার লুকোচুরি খেলা। কখনো ছুটে ট্রেনের কাছ এসে উৎস্থক মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, কেমন লাগল ? আবার কখনো দুরন্ত মেয়ের মতো বেণী দুলিয়ে—ছুটে চলে যাচ্ছে দূরে দূরে—যেখানে দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মাটির কানাকানি কথা !

হঠাৎ ট্রেণটী হয়ত একটা স্থরঙ্গ পথে (টানেলে) ঢুকে গেল। চারদিক একেধারে অন্ধকার। ইটালীর প্রকৃতিরাণী দুষ্টুমী করে চোখ টিপে ধরেছেন—বুঝি ? মনে হয় এমনি মজার ব্যাপার ?

উপত্যকাগুলি একেবারে সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে। চমৎকার টলটলে নীল জলের হ্রদ—তারি পাশে হয়ত স্থন্দর কয়েকটি হোটেল।

মনে হয় সব ফেলে দিয়ে ঐখানে গিয়ে ডেরা বাঁধি। অবাক হয়ে দেখলাম, অনেক জায়গায় সবুজ উপত্যকার ওপরই রাশি রাশি পেজা তুলোর মত নরম তুষার জমে রয়েছে। এত হাল্কা আর এত ধবধবে যে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে।

ট্রেনে চলতে চলতে কোনো কোনো শহরকে অবিকল দার্জিলিং বলে মনে হয়। তেমনি উঁচু নীচু রাস্তা। ঢেউ খেলানো পথের দুধারে সাজানো-গোছানো ছোট ছোট বাড়ী। চিম্নী দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রাস্তা দিয়ে মোটর চলাচল করছে; মাঠে ছেলের দল খেলা করছে। মেয়েরা ছাদে রঙীন জামা ইত্যাদি রদ্দুরে শুকুতে দিচ্ছে। ট্রেণ দেখে হয়ত খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝরণা দেখতে চাও? তাও প্রচুর মিল্বে এই পথে। একেবারে ট্রেনের কাছাকাছি—পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আস্ছে মাটি মায়ের স্নিগ্ধ স্তন্যধারা। শুধু দু চোখ মেলে দেখো—আশ মিট্বে না। মনে হবে—আজলা পুরে নিয়ে চোখে দি—পান করি প্রাণ ভরে।

ওদেশের গাছগুলির ধরণ বেশ।

এমন এক একটি ভঙ্গী করে উঠেছে যে মনে হবে—খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে যাই ছবি আঁক্তে। আমাদের আসরের যেসব ছেলেমেয়ে ছবি আঁক্তে পারো—তারা আমার কথা খানিকটা আন্দাজে বুঝে নিতে পারবে।

সময় চলে যাচ্ছে—শরতের মেঘের মতো হালকা হাওয়ার ভেলায় চড়ে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে যে সব কিছু ভুলে থাকা যায় সেইদিন কিছুটা টের পেয়েছিলাম।

চমক ভাঙল অষ্ট্রিয়ার মাসিমার কণ্ঠস্বরে।

তিনি বল্লেন, এক্ষুণি যে ষ্টেশন আস্ছে তার নাম হচ্ছে অর্ণল্ড-ষ্টেইন—এটা অষ্ট্রিয়া দেশের প্রথম ষ্টেশন। এইখানেই তোমাকে

ইটালী দেশের নোট লীরা বদলে অষ্ট্রীয়া দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করে নিতে হবে।

মাসিমার কথা শুনে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। সত্যই ত' ! একেবারে বাস্তবকে ভুলে প্রকৃতির পূজো করলে ত চলবে না। পথ চলতে গিয়ে যেগুলো নেহাৎ দরকারী কাজ তা চট্‌পট্‌ সেরে ফেলতে না পারলে বিপদ আমারই।

ট্রেন এসে থামতে প্রথমেই 'পাসপোর্ট' ও 'ভিসা' পরীক্ষার ধূম পড়ে গেল। রোম শহরে আমার ত' অষ্ট্রীয়ান্ ভিসা নেয়াই ছিল। তাই ভাবনার কিছু ছিল না। সেখানে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তৈরী হলাম মুদ্রা বিনিময় করবার জন্যে। মাসিমা প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটি জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লেন, 'ওইটেই হচ্ছে এক্সচেঞ্জের অফিস। ইংরেজী জানা লোক ওখানে মিলবে। কোনো ভয় নেই—সোজা চলে যাও। গাড়ী এখানে বেশ খানিকক্ষণ থাক্‌বে।

আশ্বাস পেয়ে নেমে গেলাম প্ল্যাটফর্মে। বলা বাহুল্য সাইনবোর্ড সব জার্মাণ ভাষায় লেখা। সোজা জানলার কাছে গিয়ে ইংরেজীতে নিজের দরকারের কথা বল্লাম। জবাব এলো ভাঙা ভাঙা ইংরেজীর টুক্‌রো কথায়। যাক্ ব্যাপারটা বুঝলেই আমার কাজ হবে। খুব তাড়াতাড়ি আমার প্রয়োজন মিটে গেল।

অষ্ট্রীয়া দেশের মুদ্রা পেয়ে প্রয়োজন মতো কিছু খাদ্য কিনে নেয়া গেল। এইবার একটু সাহস বেড়েছে···আর ওদেশের নামও দু একটা বল্‌তে পারলাম। এবার খাবার কিনলাম—দোকানে। একটি খাবারের দোকানের কাউন্টারের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলাম। বিদেশী বলেই হয়ত আপত্তি করল না। যে খাবারগুলো পছন্দ মত মনে হল হাত দিয়ে দেখিয়েও দিলাম। এ অঞ্চলে মেয়েরাই সব খাবার বিক্রী করে থাকে এবং যত্ন করে প্যাক করে দেয়।

সারাটা দিন ট্রেনে থাকতে হবে এবং অনেক রাত্তিরে ভিয়েনায় নামিয়ে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল—সেই কথাই বল্‌ছি।

ইউরোপ ত' শীতের দেশ—তার ওপর সারাদিন ট্রেনে বসে থেকে থেকে শরীরটা যেন ঝিমিয়ে এসেছিল। মনে হল এই সময় যদি এক কাপ গরম চা পাওয়া যার ত বেশ হয়। ট্রেনের লম্বা বারান্দা দিয়ে গাড়ীর যে কোন কামরায় যাওয়া চলে। হাটি-হাটি পা-পা করে হাজির হলাম গিয়ে রেস্তোরাঁ কারে। দোকানের লোকদের যত চায়ের কথা বলি—কেউ বুঝতে পারে না—কেবল পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে। এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গোটা ইউরোপে চা খাওয়ার প্রচলন নেই। সবাই খায় কফি। তা-ও এক কাপ—ছু কাপ নয়। যখন আসর জমে ওঠে কাপের পর কাপ কফি চলতে থাকে। ভারতবর্ষে আর ইংলণ্ডেই চায়ের প্রচলন বেশী। এ হেন যায়গার রেস্তোরাঁয় গিয়ে যখন আমি চায়ের কথা তুললাম—তখন সেখানকার লোকেরা এমন মুখের ভাব করল যেন আমি মঙ্গল গ্রহের কোনো খাবার চেয়েছি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম অষ্ট্রীয়ার মাসিমার কাছে। তাঁকে বল্লাম, জার্ম্মাণ ভাষায় লিখে দিন ত' চায়ের নাম একটা কাগজে। তিনি ত' হেসেই আকুল। বল্লেন, রেস্তোরাঁর লোকেরা বুঝতে পারেনি বুঝি কথা ? কিন্তু কি চা চাই ? র' টি-না-ছুধ দিয়ে ?

আমি জবাব দিলাম, ছুধ আর চিনি মিশিয়ে বেশ আমেজ করে এক কাপ গরম চা খেতে চাই। সেই কথাই আপনাদের ভাষায় বেশ ফলাও করে লিখে দিন। আমি ত' ওদের বোঝাতে গিয়ে হিম্‌সিম্ হয়ে গেছি।

মাসিমার লেখা চিরকুটখানি নিয়ে যখন ওদের দেখালাম—তখন

ওরা মাথা নাড়তে লাগলো। আমায় খাতির করে বসালে। জিজ্ঞেস করল, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি কিনা। ওদের ধারণা ভারতবর্ষের লোকেরাই নাকি খুব চা খায়।

যাই হোক খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বেশ দামী সেটে চা এলো। লিকার, চা, দুধ, চিনির কেক সব বিভিন্ন পাত্রে রাখা। চা ঢাল্‌বো কি—টি সেট্‌ই তাকিয়ে দেখবার মতো। যেন কোনো লর্ড চায়ের অর্ডার দিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি চা খেয়ে খুশী হতে পারলাম না। লিকার অতি পাতলা—কোনো রকম চায়ের স্বাদ কিম্বা গন্ধই পাওয়া গেল না! মিছি মিছি—ওই এক কাপ চায়ের দরুণ চার-পাঁচ টাকা বিল করে আদায় করে নিলে! এর চাইতে আমাদের দেশের যে কোন দোকানে অনেক ভালো চা তৈরী হয়।

যাই হোক—কফির দেশে যে চা মিললো এই ঢের! মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন চা খেলে? আমি বল্লাম হুঁ! কিন্তু কেমন চা পেলাম সেটা আর ব্যাখ্যা করে বল্লাম না।

রাত্রি গভীর হতে চল্লো, অনেকেই খাবার কিনে রাত্তিরের আহার শেষ করে ফেল্লে। আমিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম।

এইবার ভিয়েনা শহর এসে যাচ্ছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ভিয়েনাতে নাম্‌বে। তাই সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

ভিয়েনার দুটি ষ্টেষণ। একটি 'ওয়েষ্ট পান্‌হো' আর একটি 'ইষ্ট পান্‌হো।' অর্থাৎ পশ্চিম ষ্টেষণ এবং পূর্ব্ব ষ্টেষণ। পশ্চিম ষ্টেষণে নেমে গেলেন—আমার পূর্ব্ব পরিচিত অধ্যাপক, রুথ আর ফেলিসিটাসকে সঙ্গে নিয়ে। আরো অনেকে নাম্‌লেন—অষ্ট্রীয়ার মাসিমাও। মাসিমা ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে চিঠি দিতে বল্লেন, এবং অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে না ভুলি। যাঁর কাছ থেকে স্নেহ

পেয়েছি—তাঁকে ভোলা কি এতই সোজা? আমার মনের-মণি-কোঠায় দেবতার চাইতে মানুষরাই ত' অক্ষয় হয়ে আছে। মনের অলিন্দে তারা ভীড় করে এসে দাঁড়ায়···তাদের ভুলবো কেমন করে?

সেই বহু প্রতীক্ষিত ভিয়েনা সহরে এসে অবশেষে গাড়ী থাম্‌লো। দলে দলে যাত্রী নেমে যেতে লাগ্‌লো—ছেলে-মেয়ে বুড়ো সবাই। আমার আশা আছে কেউ না কেউ ষ্টেষণে আমাকে নিতে আসবেন। রোম শহর থেকে সাংবাদিক বান্ধবী ডেলা ভিচিয়া "আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতির" সম্পাদিকার কাছে টেলী করে দিয়েছে।

কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম—প্ল্যাটফর্ম্ম খালি হয়ে গেল কিন্তু প্রতীক্ষমান কেউ নেই! তবে কি আমার টেলী এঁরা পান নি?

বেশ অসুবিধে বোধ করতে লাগলাম। প্ল্যাটফর্ম্ম যখন সত্যি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—তখন বুঝলাম টেলিগ্রামেরই হয়ত গোলমাল হয়ে থাক্‌বে। নিজেকেই সন্ধান বের করে নিতে হবে।

একজন পুলিশকে গিয়ে সব কথা খুলে বল্লাম। সে কিছুটা ইংরেজী জানে। কাছেই তাদের হেড কোয়ার্টার। আমাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল। দেখলাম, পুলিশদের রাত্তিরে থাক্‌বার জন্যে ছোট ছোট সব বিছানা রয়েছে। যার যখন ডিউটি শেষ হবে—বাকি রাতটা এইখানে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

আমার পুলিশ সহচরটি খুব উৎসাহী। নিজেই এসে ক্রমাগত ফোন করে জান্‌তে পারলে—ভিয়েনার মিউজিক হলে—তখনো শিশুরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন চলছে।

আমাকে অপেক্ষা করতে বলে সে তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেল। ডেকে নিয়ে এলো একটি ট্যাক্সি। আমার স্যুটকেশ গুলি নিজেই

ওতে চাপিয়ে দিলে। ওদের দেশী ভাষায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কোথায় যেতে হবে সব বুঝিয়ে বল্লে। তারপর আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস করলে, সঙ্গে পয়সা কড়ি আছে ত?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। পুলিশ তখন ট্যাক্সি ওয়ালাকে যেতে অনুরোধ করলে।

আমি এদের ব্যবহারে সত্যি অভিভূত! ভাবতে লাগলাম, আমাদের দেশের পুলিশের কি এই দৃষ্টান্ত থেকে শেখবার কিছু নেই? মানুষের ব্যবহারই ত' মানুষকে আপনার করে তোলে!

দ্রুত বেগে ট্যাক্সি ভিয়েনার রাজপথ ধরে এগিয়ে চল্লো। ট্যাক্সি যখন ভিয়েনার বিখ্যাত "মিউজিক হলে"র সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো তখনো অন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন চলছে।

কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন এবং আমি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি এই খবর জান্‌তে পেরে আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে মিউজিক হলের ভেতর গিয়ে ঢুক্‌লাম।

এই পৃথিবী বিখ্যাত হলটি এত সুন্দর করে-সাজানো হয়েছিল যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হলের বিবরণ আর অধিবেশনের কথা পরে লিখব; এখন এই অবকাশে জানিয়ে রাখি আমার ভিয়েনা পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল কেন? আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের ভারতীয় আহ্বায়ক সমিতি যখন আমার নাম প্রস্তাব করলেন—তখন তাঁদের বিশেষ অনুরোধেই আমি পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করি। বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং আমি যাতে তাড়াতাড়ি 'পাসপোর্ট' পেয়ে বিদেশে রওনা হতে পারি সেজন্যে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু

কেন জানিনা—পুলিশের এস-বি বিভাগ আমার কাগজ-পত্র আটকে রাখলেন এবং জানালেন যে, অনুমতির জন্য দিল্লীতে চিঠি লিখতে হবে। গেল দিল্লীতে চিঠি···কিন্তু সেখান থেকে জবাব আর কিছুতেই আসে না! লাল ফিতের বন্ধনীতে সে যে কোথায় আটকা পড়ে রইল—তার সন্ধান করে বের করে আনবার জন্যে বিশল্যকরণী সংগ্রাহক পবন-নন্দনের হয়ত প্রয়োজন হত!

আমি পুলিশের এস-বি বিভাগকে জানালাম যে, জীবনে কোনো দিন রাজনৈতিক আবর্তে নিজেকে জড়াই নি, কেবলমাত্র সংগঠনমূলক কাজ করেছি এবং ছোটদের জন্যে পুস্তক রচনা করেছি। সুতরাং আমার পাসপোর্ট পাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি কি করে উঠতে পারে? আরও একটি বলবার কথা এই যে, আমি যে কারণে ভিয়েনা যেতে চাইছি সেটা কিশোর-কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়। ওখানে যে কোনো রকম রাজনৈতিক আলোচনা হবে না-সে আশ্বাস ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। এ সব বিষয় সত্বেত্র কেন যে পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে না—সেই কারণটাই আমি জান্‌তে চাই।

কিন্তু পুলিশের এস-বি বিভাগ—অতি ভদ্রলোক— ; সুতরাং তাঁদের এক কথা। কোনো কারণও দেখাবেন না এবং পাস-পোর্টও দেবেন না! ওদিকে রওনা হবার দিন এগিয়ে এলো। কিন্তু আমি কোন দিক দিয়েই প্রস্তুত নই! না অর্থের দিক দিয়ে, না পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে, না পাসপোর্ট সংগ্রহের দিক থেকে। কাজেই "তয়া ঋষিকেশ হৃদি স্থিতেন—যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"—এই শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করে শালগ্রামের—শোয়া-বসা সমান জ্ঞানে অবস্থান করতে লাগলাম। ওদিকে

সম্মেলন এসে গেল। বুঝলাম—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়! কিন্তু মাটির মানুষ ত একেবারে ভগবান হয়ে সমস্ত চেষ্টা বন্ধ করে 'ব্যোমভোলা' স্বরূপ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না! কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

হঠাৎ খেয়াল গেল—তাইত! কলকাতার ভূতপূর্ব্ব চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর গুপ্তের সংগে আমার পরিচয় আছে। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবংগ সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী। তিনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। যুগান্তর কার্য্যালয় থেকে ফোন করে সব কথা জানালাম তাঁকে। বল্লাম, একজন সাহিত্যিককে পাসপোর্ট না দেবার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

খুব মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেন শ্রীযুক্ত গুপ্ত আমার কাহিনী। তারপর বল্লেন, এ কথা আমায় আগে বলেন নি কেন? আমি এক্ষুণি আপনার কাগজ-পত্র তলব করে পাঠাচ্ছি, দু' ঘণ্টার মধ্যে আপনার পাস্‌পোর্টের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আবার আশার প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল। বুঝলাম যাওয়াটা নেহাৎ-ই কপালে আছে। দিনটি ছিল শুক্রবার। সন্ধ্যের দিকে আবার ফোনে জান্‌তে পারলাম যে, পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামী কাল শনিবার সকাল দশটায় রাইটাস বিল্ডিংসে গিয়ে শ্রীযুক্ত সোমের কাছ থেকে ওটা চেয়ে নিতে হবে।

হিসেব করে দেখা গেল যে, শনিবার মাত্র তিন ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে এবং তার ভেতরই রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে, আলীপুর ইটালিয়ান কন্‌সোলেট্ অফিস থেকে ইটালীর ভিসা যোগাড় করতে হবে; কে, এল, এম, অফিসে গিয়ে সিট্ বুক করতে হবে, টমাস কুক্ অফিসে ট্র্যাভেলার্স-চেক্ সংগ্রহ

করতে হবে, আর যোগাড় করতে হবে—কর্পোরেশন থেকে হেল্‌থ্‌ সার্টিফিকেট। লোকে বর্দ্ধমান যেতে হলেও ভেবে চিন্তে তার কাপড়-জামা গুছিয়ে নেবার সময় পায় কিন্তু আমি সে সুযোগও পেলাম না। একেবারে হিট্‌লারী "ব্লিৎস্‌ক্রিগ্‌" পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ সমাপ্ত করতে হল।

কর্পোরেশনের হেলথ সার্টিফিকেট আবার শনিবার পাওয়া গেলনা। সেজন্য রবিবার সকালে ধাওয়া করতে হল—বালিগঞ্জের সরকারী টিকা দেবার অফিসে। মাঝখানে এই রবিবারটিই ছিল হাতের মুঠোর মধ্যে ; সোমবার ১লা বৈশাখ ত রওনা হতেই হবে। আমার যে সব বন্ধু ইউরোপ গিয়েছেন তাদের দেখেছি ক' মাস আগে থেকে উদ্যোগ-পর্ব সুরু করতে। কিন্তু আমি যেন কলকাতার কাছেই কোথায়ও বন-ভোজন করতে যাচ্ছি—এইভাবেই তৈরী হয়ে নিতে হল। এই উদ্যোগ-পর্ব্বের ব্যাপারে সব পেয়েছির আসরের কর্মী হরলাল বর্দ্ধন আমায় খুব সাহায্য করেছে। আমার সঙ্গে সে না-খেয়ে-দেয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি না করলে আমি কিছুতেই সব কিছু গুছিয়ে নিতে পারতাম না।

এই ভাবে দেরী করে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্যেই আমার ভিয়েনায় পৌঁছুতে অযথা বিলম্ব হয়েছিল। আমার ইউরোপ যাত্রায় আর কিছু না থাক একটি অভিযানমূলক চাঞ্চল্য ও নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। আমার বাড়ীর লোকেরাই ভালো করে বোঝাবার সুযোগ পায় নি যে, আমি ইউরোপ যাত্রার জন্যে হঠাৎ প্রস্তুত হয়েছি। নিকট আত্মীয়-স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব সবাই খবরটা জানতে পারেন আমি রওনা হয়ে যাবার পরে।

এইবার আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা-সম্মেলন সম্পর্কে যে কথা বল্‌ছিলাম—সেই আলোচনায় ফিরে আসা যাক্‌।

ভিয়েনার মিউজিক হলটি অতি সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিল। সভাপতির মাথার ওপর তিনটি ছেলের ছবি প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে একটি বিরাট প্রাচীর-চিত্র স্থাপিত হয়েছিল। উত্তরে আইস-ল্যাণ্ড থেকে সুরু করে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে আমেরিকা পর্য্যন্ত ৬৪টি দেশের ছয়শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ভারত, পাকিস্থান ব্রহ্ম, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, চীন, কোরিয়া মঙ্গোলিয়া, সৌদি আরব, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলির উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ কে, সি, চৌধুরী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। ডাঃ চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন—তাতে দেখা যায় যে, একমাত্র রাশিয়া ছাড়া অন্য দেশের শিশুদের অবস্থা সত্যই নৈরাশ্যজনক।

সম্মেলন কক্ষটি (মিউজিক হল) ৬৪টি দেশের জাতীয় পতাকা দ্বারা শোভিত ছিল। এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান ও বক্তৃতাবলি ছয়টি ভাষায় প্রচার করা হয়। সেই ভাষাগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ইংরাজী, জার্ম্মান, ফরাসী, ইটালী, রুশ ও স্প্যানিশ।

প্রত্যেক প্রতিনিধির টেবিলের ওপর বিভিন্ন হেডফোন থাকতো। যখন একটি বক্তা বক্তৃতা দিতেন সঙ্গে সঙ্গে সেই বক্তৃতাটি ছয়টি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার ব্যবস্থা হত। নিজের আসনে বসে চিহ্নিত হেডফোন ব্যবহার করে সেই বিশেষ ভাষায় বক্তৃতা শোনার ব্যবস্থা ছিল।

ভারতবর্ষ থেকে যে সকল প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাদের নাম নেতা—ডাঃ ক্ষীরোদ চন্দ্র চৌধুরী

মিসেস্ ওয়াদিয়া, শ্রীযুক্তা শান্তা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শেফালী নন্দী, শ্রীঅমল সাহা, ডাঃ ধ্রুবরঞ্জন সরকার ও শ্রীঅখিল নিয়োগী।

ফরাসী প্রতিনিধির প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের ৫২ জন সদস্য নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের ডাঃ কে সি চৌধুরী তার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

ফরাসীদেশের প্রতিনিধি অধ্যাপক মনোত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের সম্পর্কে এক সাধারণ রিপোর্ট পেশ করেন।

ইটালীদেশের প্রতিনিধি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক বিবরণী দাখিল করেন। বৃটিশ সদস্য মিঃ কিলবার্ণ শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেন।

জার্ম্মাণ সদস্য ম্যাডাম গুরু সচিরৎস বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নাইজেরিয়ার সদস্য এবং শেষ অধিবেশনে রুশ ও রুমানিয়ার সদস্য সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন।

ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ চৌধুরী বলেন যে, ভারতে শিশুর সংখ্যা ১৪ কোটির মত। তাদের কল্যানকর আরো বহু প্রতিষ্ঠানের এখনো প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে দেশে অর্থেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ডাঃ চৌধুরী শিশু চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, প্রতিবৎসর ১লা জুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেন শিশু-দিবস পালন করেন এবং এই বিশেষ দিনটিতে যেন শিশুদের কল্যানজনক কাজ সম্পাদিত হয়।

শিশুদের স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা, শিক্ষা ও উন্নতির জন্য সকল

দেশ আন্তর্জ্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনের আদর্শ গ্রহণ করবে বলে এই সম্মেলনে আশা প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন সেজন্য সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই একটি ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—সম্মেলন পরিচালনার কার্য্যালয়ে।

প্রত্যেক দেশ থেকেই প্রতিনিধিরা কিছু কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সব পেয়েছির আসরের ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল বাঙ্গলাদেশের নিজস্ব খেলনা পুতুল আর রাখি। আমি দুটো জিনিষই প্রেসিডেন্টকে উপহার দিলাম। 'রাখি' যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের নিদর্শন সেকথা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। সকলেই ভারতের "রাখির" বিশেষ প্রশংসা করলেন এবং তার তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে পারলেন।

৬৪টি দেশের সব প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ হওয়া সম্ভবপর নয় এবং সকলেই এই ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তবু যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। আলাপ হল নিউইয়র্কের নিগ্রো মেয়ে মলি লুকাসের সঙ্গে। নিগ্রোদের সঙ্গে আমেরিকানরা কিরূপ অভদ্র ব্যবহার করে সেই সব কাহিনী মেয়েটি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করল। মেয়েটির বয়স একেবারে কম। হয়ত সে কোন বিদ্যালয়ে পড়ে। তার সঙ্গে তার বন্ধু এক আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ মেয়েও ছিল। সেও তার কথা সকল দিক দিয়ে সমর্থন করল। কালো আর সাদা হলেও ওদের দুজনের মধ্যে বিশেষ প্রীতির সম্পক রয়েছে দেখতে পেলাম। শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি বর্ত্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি সে নিউইয়র্কে ফিরে যাবেনা। মলি লুকাস একাই চলে

যাচ্ছে দেশে। মলি তার ঠিকানা লিখে দিলে আমার নোটবুকে আর যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করলে।

আলাপ হল অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিসেস ভেনা বারহনের সঙ্গে। আমাদের সব পেয়েছির আসরের যে ছাপানো সংক্ষিপ্ত পরিচয় পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলি প্রত্যেক প্রতিনিধিকে দিলাম। তাঁরা বিশেষ যত্নসহকারে রেখে দিলেন নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাবেন বলে। ভারতের কিশোর-আন্দোলন সম্পর্কে অনেকের সঙ্গে আলোচনা হল। আমাদের আসরের কথা, মনি-মেলার কথা, বোম্বাইএর বালকানজী-বাড়ীর কথা ওদের জানিয়ে দিলাম।

বার্লিনের মেরী ক্লড ও ডারমিনির সঙ্গে বেশ আলাপ হল। এরা দুজনেই খোলাখুলি আলোচনা করতে ভালোবাসেন এবং সব দেশের খবরই অল্প-বিস্তর রাখেন। দুজনেই চমৎকার ইংরাজী বলতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি সিলি ফিসার খুব গপ্পীমেয়ে। তিনিও তাঁর দেশের অনেক কাহিনী বল্লেন এবং ঠিকানা দিলেন চিঠি পত্র লিখতে। বল্লাম, আলাপই শুধু হচ্ছে কিন্তু এইসব দেশে যাবার সুযোগ ত আর কোনো কালে হবেনা! চীনদেশের পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উ-চো জেনের সঙ্গে আলাপ হল। ইনি খুব বিদ্বান আর মহাশয় ব্যক্তি। বিদ্যার কোনো রকম অহঙ্কার নেই। সকলের সঙ্গে একভাবে মেলামেশা করছেন।

আলাপ হল পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিসেস আলি মহম্মদের সঙ্গে। মহিলাটি এত মিশুকে যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার করে নিতে পারেন। দূর দেশে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার কোন

লক্ষণ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলাম না। ভিয়েনাতে থাকতে মিসেস আলি মহম্মদ সম্পর্কে যে মজার ঘটনাটি ঘটেছিল সেই কথাই এই ফাঁকে বলে রাখি। প্রথমে গিয়ে তিনি অন্যান্য ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধির মত শাড়ী পরেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন। তার ফলে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা তাকে ভারতের প্রতিনিধি বলে গণ্য করতেন এবং সেই ভাবেই আহ্বান জানাতেন। পাছে পাকিস্থানের নাম উহ্য হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তখন তাড়াতাড়ি সাড়ী পাল্‌টে সালোয়ার ইত্যাদি পরিধান করতে শুরু করে দিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি কিন্তু অত্যন্ত অমায়িক এবং খুবই আলাপী। আমরা যে সবাই এক দেশ থেকেই গিয়েছি সে বিষয়ে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। মিসেস আলি মহম্মদের দেশ হচ্ছে লাহোরে। তাঁর আন্তরিকতার কথা কোনো দিনই ভুলতে পারবো না।

সিরিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন—মোনা ফউয়াজ নামে এক তরুণী শিক্ষয়িত্রী। দেখতে এত সুন্দরী যে, চোখ মেলে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়। তাঁর সঙ্গে সিরিয়া দেশ সম্পর্কে অনেকক্ষণ বসে আলাপ হল। ও দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য নাকি খুবই ভালো এবং খাদ্যেরও কোনো অভাব নেই। ওদের স্বাস্থ্য যে ভালো সে কথা আমরা ওঁকে দেখেই অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম। তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁদের দেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কেও কিছু বল্লেন। মহিলাটি বিবাহিতা। তাঁর স্বামী অন্যত্র চাকরী করেন। তিনি আছেন শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে।

আমি এবং আর একজন ভারতীয় প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যেও বাঙলা ভাষায় আলোচনা কালে—'মুস্কিল' কথাটার উল্লেখ করতে তিনি হেসে বল্লেন, কি 'মুস্কিল' 'মুস্কিল' করছেন? ওটা ত আমাদের

দেশের কথা। শুনে আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। পরে তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আরব ও পারস্যের বহু শব্দ এই ভাবে বাঙলা ভাষার মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে!

ঘরোয়া বৈঠকে সময় ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আরো অনেকের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মৌখিক আলাপটা সেরে নিলাম কিন্তু তাঁদের নামগুলি আর আজ স্মরণ করতে পারছিনে। ঐ দিনই দুপুর বেলা—চীন দেশের প্রতিনিধিরা—সমগ্র এশিয়া দেশের প্রতিনিধিদের এক প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ মধুর বলে মনে হয়েছিল।

যে চীন দেশীয় মেয়েটির পাশে আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁর নাম হচ্ছে—হুয়াং চিয়েন জু। ইনি সাংহাই শহরের ওয়াই, ডাব্লু, সি, এ তে থাকেন। জাতিতে ইনি খৃষ্টান কিন্তু নিজের দেশের কথা বল্‌তে গিয়ে আনন্দে ও উৎসাহে একেবারে যাকে বলে পঞ্চমুখ। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই—জীবনের বিভিন্ন স্তরে চীন দেশের কেমন উন্নতি হয়েছে—সেকথা তিনি আমায় ভোজ চলা কালে নিম্নস্বরে সব বুঝিয়ে দিলেন। মেয়েটি এত মিশুকে যে খুব তাড়াতাড়ি পরকে আপন করে নিতে পারে।

ভোজের গোড়াতেই যে কৌতুকজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই কথাই আগে বল্‌ছি। এই জাতীয় ভোজের নিয়ম হচ্ছে—আগে সব দেশের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পান করতে হয়। প্রথমেই সকলের সামনে মদ পরিবেশিত হল। দাঁড়িয়ে উঠে কাচের গেলাস ঠোকাঠুকি করে স্বাস্থ্য পান করতে হবে। তখন আমার সমূহ বিপদ! আমিও খাবো না—হুয়াংও কিছুতেই ছাড়বেন না। বল্লেন, স্বাস্থ্য পানের নামে ওটা পান করতেই হবে। নইলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হয়। আমি তার কানে-কানে বল্লাম, আচ্ছা

সামনে জলের গেলাস রয়েছে—তাই থেকে কাজ চালিয়ে দিলে কেমন হয়? তিনি একান্ত নাছোড়বান্দা। কাজেই বাধ্য হয়ে কুইনিন গেলার মতো কিছুটা ঢক্ করে গিলে ফেল্লাম!

হুয়াং খুশী হয়ে আমায় সার্টিফিকেট্ দিলেন যে, এইবার ভদ্রতা-সম্মত কাজ হয়েছে। ভারত সম্পর্কেও হুয়াং চিয়েন অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আমিও সাধ্যানুসারে তার জবাব দিতে লাগলাম।

আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন—বোম্বাই অঞ্চলের প্রতিনিধি মিসেস্ ওয়াদিয়া। এখন মুস্কিল হচ্ছিল এই যে, সব চীনা ভদ্রলোক ত' ইংরেজী জানেন না—! তার ফলে মিসেস্ ওয়াদিয়া চীনদেশ সম্পর্কে আলাপ করতে পারছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল—হুয়াং চিয়েনের সঙ্গেএকটু আলাপ করেন। কাজেই তিনি আমায় ডেকে বল্লেন, মিঃ নিয়োগী, আমি কি আপনার সঙ্গে যায়গাটা বদল করতে পারি? আমি জবাব দিলাম, বিশেষ আনন্দের সঙ্গে। খুশী মনে আমি তাঁদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনার সুযোগ করে দিলাম।

সেদিনের ভোজটি আন্তরিক আলাপ-আলোচনায় এবং খাদ্যের দিক থেকে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। চীন দলের নেতা সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পাল্টা ধন্যবাদের পালা চুকে গেলে—ভোজ-সভা সমাপ্ত হল। তখন সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালে প্রতিনিধিদের নিয়ে ছবি তোলার ঘটা পড়ে গেল। আমাদের ভারতের প্রতিনিধিরাও ক্যামেরা নিয়ে অনেক ছবি তুল্লেন।

ভিয়েনাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের যিনি দোভাষী ছিলেন সেই অক্লান্ত কর্মী তরুণী মিস্ হেলেন পিক্সনার সম্পর্কে এ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় নি। এ রকম একটি কর্ম্মঠ মেয়ে আমি আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এই অষ্ট্রিয়ান তরুণীর এত প্রখর দৃষ্টি ছিল—যে, সব সময়ই তাঁর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি নিজে ইংরেজী খুব ভালো জান্‌তেন বলে আমাদের কথা-বার্ত্তা চালানোর খুব সুবিধে হয়েছিল। দোভাষীর কাজ করা ছাড়াও বন্ধু হিসেবে তিনি আমাদের কত যায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছেন এবং নানা ভাবে তাঁর সঙ্গ দান করে বিদেশে আমাদের উৎফুল্ল রেখেছেন। মোট কথা সুদূর ভিয়েনা শহরে তাঁকে আমরা প্রকৃত সুহৃদরূপে পেয়েছিলাম—যার জন্যে আমাদের কোন অসুবিধেই হয় নি। হেলেন পিক্সনারের চশমায় ঢাকা চোখ দুটি দেখে মনে হয় তিনি সব সময়ই খুব পড়াশুনা নিয়ে থাকেন। যারা গ্রন্থকীট হয় তাদের কিন্তু বাস্তব জগতে বিশেষ কাজের মেয়ে বলে মনে হয় না। কিন্তু মিস্ পিক্সনারের মধ্যে একাধারে ধরা পড়েছে—জ্ঞানানুশীলন ও কর্ম্মকুশলতা। অথচ বয়েস তার এমন কি বেশী।

মিস্ পিক্সনারের সঙ্গে একদিন গেলাম—ওখানকার সেরা দৈনিক কাগজের অফিসে। এই কাগজটির নাম হচ্ছে Fleisch Mark। সারা অষ্ট্রিয়ায় এই কাগজের মতো প্রচার আর কারো নেই। মিস্ পিক্সনার কাগজের প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। সুদূর ভারতবর্ষের আমি একজন সাংবাদিক শুনে তিনি খুব খাতির করে আমায় তাঁর খাস কামরায় নিয়ে গেলেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা সুরু করলেন। যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি

পরিচয়-পত্র আমার সঙ্গে ছিল—সেটি তাঁকে দেখালাম। একথাও জানালাম যে, "যুগান্তর" হচ্ছে বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বাধিক প্রচারিত দৈনিক। সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে ঘরোয়া আলোচনা চল্‌লো।

এই কাগজের অফিস থেকেই ছোটদের আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "Unsere Zeitung". ছোটদের এই সচিত্র কাগজখানি রোটারীতে বহু বর্ণে ছাপা হয়। কিন্তু ছাপা এত সুন্দর যে, দেখে মনে হয় না রোটারীতে মুদ্রিত হয়েছে! তিনি একখানি ছেলেদের কাগজ আমায় উপহার দিলেন। হঠাৎ একটি জরুরী ফোন আসায় প্রধান সম্পাদক কার্য্যান্তরে চলে গেলেন এবং আমার সঙ্গে সাংবাদিক জর্জ্জ আউয়ারের আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন। এই সাংবাদিক বন্ধুটি বয়সে তরুণ, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁর জানবার খুব আগ্রহ। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কার্য্যালয়টি ঘুরে দেখালেন। আমি যে সুদূর ভারত থেকে এসে সংবাদ পত্রের অফিস পরিদর্শন করলাম—খবর হিসেবে সেটা তাঁরা নোট করে নিলেন। আমি নিজে জার্ম্মাণ ভাষা জানিনে বলে সে সংবাদ কাগজটিতে কবে প্রকাশিত হয়েছিল বল্‌তে পারবো না।

মিস্ পিক্সনার বল্লেন, তাঁর এক বোন এই সংবাদ পত্রে কাজ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সে সময় তিনি অফিসে উপস্থিত ছিলেন না বলে আলাপ করা আর হয়ে উঠ্‌ল না। মিস্ পিক্সনারের অন্যত্র কাজ ছিল বলে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আগেই চলে গেলেন।

ফেরবার মুখে সাংবাদিক বন্ধু জর্জ্জ আউয়ার বল্লেন, আপনি

হয়ত রাস্তা ভুল করে ফেল্‌বেন—চলুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি আপত্তি জানিয়ে উত্তর দিলাম, না-না, তাতে আপনার কাজের অনেক ক্ষতি হবে।

কিন্তু তিনি আমার কোনো আপত্তিই শুনলেন না। দুজনে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বেরিয়ে পড়লাম। চল্‌তে চল্‌তে তিনি বল্লেন, প্রধান সম্পাদকের নির্দ্দেশ আছে আপনাকে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে। সাংবাদিকের সৌজন্য-বোধ দেখে সত্যি মুগ্ধ হলাম। দুজনে গল্প করতে করতে রাজপথ ধরে চল্‌তে লাগ্‌লাম। আলোচনার বিষয় ছিল সাংবাদিকতা, শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং আরো কিছু-কিছু। আমরা ট্রামে কিংবা বাসে করেই আস্‌তে পারতাম। কিন্তু তখন হাঁট্‌তেই ভালো লাগ্‌ছিল। বিকেল বেলা দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়েরা নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে চলেছে। তাদের স্বাস্থ্য ও চলন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মতো। ভিয়েনার রাজপথে সব সময়ই দেখেছি—ছেলে মেয়েরা মুড়ি-মুড়কির মতো আপেল, কমলা লেবু, কলা, চকোলেট, ক্রীমের তৈরী খাবার ইত্যাদি খেতে খেতে চলেছে। রুগ্ন স্বাস্থ্যের ছেলে মেয়ে বড় একটা চোখে পড়েনি। দেখে দেখে শুধু ভেবেছি—আমাদের ভারতবর্ষেও ত' প্রচুর ফল জন্মে, কিন্তু কয়জন অভিভাবক তাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন সময়কার ফল খাওয়াতে পারেন? অন্য দেশের প্রাচুর্য দেখে এটা ঈর্ষার কথা নয়। শুধু মনে-মনে ভাবা যে, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েও কবে এই রকম প্রচুর পুষ্টিকর আহার পাবে এবং তারই ফলে স্বাস্থ্য হবে তাদের চোখ মেলে দেখ্‌বার মতো! নিজের দেশের ছেলে মেয়েদের রোগা টিং-টিঙে চেহারার কথা কেবলি মনে পড়ত এবং

এদের সঙ্গে তুলনা করে ভারী মুষড়ে পড়তাম! মনে মনে আওড়াতাম—

“দিন আগত ঐ
ভারত তবু কৈ?
সে কি রহিল সুপ্ত সব জন পশ্চাতে?”

সাংবাদিক বন্ধুটি আমায় হোটেলের দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন এবং বলে গেলেন যে, আর একদিন তিনি আস্‌বেন। একদিন নয়—তার পর দু’দিন তিনি এসেছিলেন এবং একদিন ফোনও করেছিলেন। কিন্তু আমি ভিয়েনা শহর তখন চষে বেড়াচ্ছি—তাই তার সঙ্গে আর মোলাকাৎ হয় নি!

শুধু অকারণ পুলকে ভিয়েনা শহরের রাজপথ ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোথায় লুকিয়ে আছে ওদের জীবনী-শক্তির মূলমন্ত্র? এত দ্রুতবেগে ওরা হাঁটে কি করে? ওদের দিকে তাকালে মনে হয়—সবাই যেন ছুটেছে ট্রেণ ধরবার জন্যে! এক মুহূর্ত দেরী হলেই ট্রেন ফেল হবার সম্ভাবনা!

অনেক সময় পার্কে গিয়ে বস্‌তাম—ছোটদের খেলা দেখ্‌তে আর ওদের সঙ্গে মেশবার জন্যে। ছোটদের আলাদা একটা ভাষা আছে। সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত না করেও যে ছোটদের সঙ্গে দিব্যি মেলামেশা করা যায়—এটা আমি বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি। ভাষার বন্ধনকে অতিক্রম করেও ছেলে-মেয়েরা যে মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করে নেয়—বুঝি তার তুলনা মেলে না! ছোটদের নিজেদের মধ্যেও এই মিতালীর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেছি বিমানে চলাকালে। কেউ কারো ভাষা জানে না তবু বন্ধুত্ব ঠিক জমে যাচ্ছে।

কোনো কোনো সময় ট্রামে ছোটদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমে

যেতো। ওদের সঙ্গে মা কিম্বা দিদি যদি থাকতেন—তবে তাঁরা এই জাতীয় 'আন্তর্জাতিক প্রীতিতে' বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের আলাপ জমানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। কোনো কোনো দিন মজার ব্যাপারও যে না ঘট্‌ত তা নয়। একটি ছেলেকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, বল ত ইণ্ডিয়া কোথায়? সে বই খাতা-পত্তর নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে ইস্কুলে যাচ্ছিল। এই জাতীয় একটি প্রশ্ন শুনে সে সত্যি হক্‌চকিয়ে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল—সুদূরের কোনো গ্রহ সম্বন্ধে তাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে। ওর মা ছেলেকে জবাব দিতে খুব উৎসাহ দিলেন—কিন্তু অবাক ছেলেটির মুখ থেকে আর কোনো কথা বেরুলো না!

আর একদিন অন্যরকম একটি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। ট্রামে করে আমি একা-একাই যেন কোথায় যাচ্ছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার ওপাশে এক ভদ্রলোক এসে বস্‌লেন—তাঁর চেহারাটা অবিকল হিট্‌লারের মতো দেখতে। আমি তাকিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম! এমন অদ্ভুত মিল সচরাচর দেখা যায় না। সেই রকম মুখ, চোখ, চিবুক, এমন কি বাটার ফ্লাই গোঁফ আর চুল অবধি! হিট্‌লার কি তার গোর থেকে উঠে এলো নাকি? যত তাকিয়ে দেখি তত আমার বিস্ময় বেড়ে যায়! আসল হিট্‌লার যে অনেক নকল হিট্‌লার পুষে রাখতেন—এই ভদ্রলোককে দেখলে সেকথা অবিশ্বাস করবার যো থাকে না। কোনো সিনেমা কোম্পানী যদি হিট্‌লারের জীবনী নিয়ে ছবি তৈরী করেন তবে এই ভদ্রলোককে মনোনীত করে নিলে অর্দ্ধেক কাজ এগিয়ে থাক্‌বে। আমার সঙ্গে যদি ক্যামেরা থাক্‌তো তবে আমি ফটো তুলে এনে দেখাতে পারতাম—সত্যি ভদ্রলোক অবিকল হিট্‌লারের মতো কিনা! পরে ভেবে দেখ্‌লাম—হিট্‌লার ত অষ্ট্রীয়া দেশেরই মানুষ!

কি আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য! আমাদের দেশেও আমরা অনেক সময় নকল রবীন্দ্রনাথ, নকল গান্ধীজী, নকল নেতাজী নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু এরকম চেহারার মিল বড় একটা চোখে পড়ে নি!

ভিয়েনা শহরের রাস্তাঘাটগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। পথ চল্‌তে গিয়ে কেউ পোড়া সিগারেট, অকেজো কাগজ, কলার খোসা কিম্বা কোনো জঞ্জাল রাস্তায় ফেলে না। সেজন্য আলাদা যায়গা নির্দিষ্ট আছে। কল্‌কাতা শহরে যেমন রাস্তার বাঁ দিকে ট্রাম-বাস থেকে নাম্‌তে হয় ওখানে উল্টো—সব ডান দিকে। এ জন্যে আমাদের প্রায়ই ভুল হত। ভিয়েনার গাড়ীগুলি খুব স্পিড দিয়ে চলে। এজন্যে যেখানে-সেখানে রাস্তা পার হওয়া খুব বিপদ জনক। কোনো কোনো রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলের রাস্তা বেশ উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো। দিব্যি ছায়ায় ঢাকা পথ। পথ চল্‌তে গিয়ে বিকেলের দিকে দেখা যায় মাঝে মাঝে রাস্তার কোনে দিব্যি নিরিবিলি যায়গায়···ছোট ছোট চেয়ার টেবিল পাতা—আশে পাশে ফুল-লতা-পাতা-টব দিয়ে সাজানো। দলে দলে মেয়ে পুরুষ এইখানে এসে বসে কফি পান করে, গল্প গুজবে আসর জমিয়ে তোলে, তারপর যে যার আবাসে চলে যায়। বিকেলের দিকে যে দিন মিঠে রোদ ওঠে সেদিন এই সব জায়গায় স্থান খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। সব কিছুতেই এরা সৌন্দর্য্যের সন্ধান করে। মনে হয় জীবনকে এরা উপভোগ করতে জানে।

একদিন গেলাম এখানকার ইস্কুল দেখতে। ছেলেমেয়েরা তখন দল বেঁধে খেলাধূলা করছে। খানিকটা খেলাধূলা দেখে ফিরে এলাম। ক্লাশের ভেতরটা আর দেখা হল না।

রবিবার দিন দুপুর থেকে ভিয়েনার ছেলেমেয়েদের কোনো

প্রলোভন দেখিয়েই আর শহরে আট্‌কে রাখা যাবে না। প্রত্যেকের পিঠে ঝোলানো একটি করে থলে আর হাতে স্যুটকেশ। ওরা চলেছে দল বেঁধে কোনো পাহাড়ের নীচে, কোনো নদীর ধারে, কোনো গাঁয়ে কিম্বা নির্জ্জন ঝরণা তলায়। সেখানে সারাদিন আনন্দের ভেতর দিয়ে বন-ভোজন করবে, খেলাধূলা করবে, ছবি আঁক্‌বে। কেউ কেউ আবার ছিপ নিয়ে চলেছে। পুকুরে কিম্বা নদীতে মাছ ধরবে। যারা খুব ছোট তাদের সঙ্গে অভিভাবকেরাও চলেছেন। থলেতে তাদের জন্যে নানারকম খাবার আর ফল। এই সব দল যে কী আনন্দের সঙ্গে বাস ভর্ত্তী করে শহর ছেড়ে চলে যায় তা দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। মনে হয় আনন্দ এদের জীবনে উপ্‌চে পড়ছে। অথচ মজা এই যে, এখনো ভিয়েনা সহরে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ভাঙ্গা গির্জ্জা, বোমায় গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়ী এখনো যুদ্ধের সাক্ষ্য দেয়। তবু এইজাতি প্রাণ স্পন্দনে উচ্ছল!

ভারতবর্ষ থেকে যে সব প্রতিনিধি ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন তার ভেতর বোম্বের মিসেস ওয়াদিয়া শুনতে পাই কোটিপতির স্ত্রী। এঁর স্বামী ভারতসরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মস্কোতে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছেন—আর ইনি এসেছেন এখানে। নাম করা ধনী-পত্নী হলেও সকলের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেশবার একটা সহজাত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মিসেস ওয়াদিয়ার। অবশ্য একটা ব্যাপারে ইনি নিজের আভি-জাত্য বজায় রেখেছেন যে, নিজে আলাদা নামকরা হোটেলে নিজের ব্যয়ে রয়েছেন। তবে চলা ফেরা ও মেশার দিক দিয়ে ইনি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় চলেন। সেখানে নিজের কোনো গর্ব্ব বা অহঙ্কার নেই। আমাদের সঙ্গে কতদিন পায়ে হেঁটে ভিয়েনার পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যে কোন খাবারের দোকানে

ঢুকে আমাদের খাইয়েছেন, অনর্গল গল্প বলেছেন আমাদের কাছে। মিসেস ওয়াদিয়া আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরুতেন আর বলতেন, যে কটা টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি সেগুলো খরচ করে যেতে হবে ত! তাই পথে বেরিয়েই বা কোনো দোকানে ঢুকে মার্কেটিং করতে সুরু করে দিতেন। তা' চকোলেট হোক, সুটকেশ হোক আর জুতোই হোক্! নিজের ছেলেমেয়ের কথা বলতে খুব ভালবাসতেন মিসেস ওয়াদিয়া। ওদের যে বোম্বেতে ফেলে এসেছেন সেজন্য মনে মনে বোধ করি অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেন। নিজের স্নেহশীল বাবার কথা বলতেও এই মহিলাটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। খুব ছেলেবেলা থেকেই বাপের কাছে নাকি ছিল তাঁর যত আবদার।

একদিন মিসেস ওয়াদিয়া প্রস্তাব করলেন চলুন, আজ একসঙ্গে বেড়ানো যাক। কিন্তু তার আগে সকলেরই কিছু না কিছু ছুট্‌কো কাজ হাতে ছিল। মিসেস ওয়াদিয়া প্রস্তাব করলেন আসুন, ঠিক দেড়টার সময় একটা জায়গায় সবাই মিলবো, তারপর একসঙ্গে রওনা হওয়া যাবে। তিনি একটি গির্জ্জার ঠিকানা বলে দিলেন। সেই রকমই কথা পাকা হয়ে গেল।

যথাসময়ে পৌঁছে দেখি চার্চ্চের ভেতর মিসেস ওয়াদিয়া একটি মহিলার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। খানিক পরেই শ্রীমতী শেফালী নন্দী ও মিস পিক্নার এসে হাজির হলেন। চার্চ্চের অভ্যন্তর ভাগটা সত্যি দেখবার মতো। অনেকদিনের পুরাণো। বিগত যুদ্ধের সময় বোমা বর্ষণের ফলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল— এখন নূতন করে সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু কাজ এখনো শেষ হয়নি। কিছুক্ষণ ভেতরে ঘুরে ঘুরে আমরা চার্চ্চটা আগে ভালো

করে দেখে নিলাম। তারপর পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরুলাম। মিসেস ওয়াদিয়ার কথা যা বলেছি ঠিক তাই। দু'পা এগিয়ে যান আর জিনিষ কিনতে চান! অমুককে সুটকেশ কিনে দিতে হবে। অমুককে একজোড়া ভালো জুতো কিনে দেবো কথা দিয়েছি। এ-দোকান ও-দোকান সে-দোকান। অবশ্য সঙ্গে বেড়ানোটাও বাদ যাচ্ছেনা। ঘুরে ঘুরে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন মিসেস ওয়াদিয়া প্রস্তাব করলেন চলুন, একটা দোকানে ঢুকে কেক, কোল্ড্ ড্রিঙ্ক ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা যাক। বেশ খানিকটা আনন্দে কাটল সেই দোকানে।

হ্যাঁ, একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। আমরা যখন চার্চ্চ থেকে বেরিয়ে আসি সেই সময় একটা লোক চার্চ্চের পক্ষ থেকেই ভিক্ষা চাইছিল। অবশ্য ভিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা আমাদের মোটেই ছিলনা। আমরা চলেই আসছিলাম। কিন্তু লোকটি মিসেস ওয়াদিয়ার সাজ পোষাক দেখে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে পাক্ড়ে ধরল। তিনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তাকে একটি কি দিলেন—তারপর আমরা সবাই মিলে পথ চলতে লাগলাম। কিছুটা পথ চলে আসবার পর হঠাৎ শোনা গেল—পিছন থেকে চীৎকার করে কে আমাদের ডাকছে। ব্যাপার কি? আমরা থমকে দাঁড়ালাম। দেখা গেল—সেই লোকটি ছুটতে ছুটতে আসছে, হাতে তার মিসেস ওয়াদিয়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। ওই যে তিনি খুচরো পয়সা বের করতে ওটা খুলেছিলেন—ভুলে সেটা না নিয়ে এসে ঐখানেই ফেলে এসেছেন! মিসেস্ ওয়াদিয়া বল্লেন, দেখেছেন কাণ্ড? ওকে কিছুই দিতে চাইনি—অথচ সেই লোকটাই আমার ব্যাগটা বাঁচিয়ে দিল। অনেক দরকারী জিনিষপত্র আছে কাগজটাতে।

লোকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পথ চলতে সুরু করলাম।

এক সন্ধ্যায় আমরা মিসেস ওয়াদিয়ার ওখানে গল্প করতে গেছি। সঙ্গে রয়েছেন ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী আর মিসেস মুখার্জ্জী।

ড্রয়িং রুমে বসে গল্প হচ্ছিল। মিসেস ওয়াদিয়া চলে যাচ্ছেন আবার কার সঙ্গে কবে দেখা হবে ঠিক নেই! মনোরম সন্ধ্যায় আসরটি বেশ জমে উঠেছে। ওদিকে রাত্রি যে গভীর হয়ে গেছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ মিসেস ওয়াদিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লেন, অ্যাঁ একেবারে সাড়ে নটা বেজে গেছে যে! এখন ত আর আপনাদের উঠতে দিতে পারিনে। আমি ডিনারের কথা বলে আসি হোটেলে—

ডাঃ চৌধুরী যত আপত্তি করতে যান—মহিলাটি তত আমাদের ধমক্ দিয়ে বসিয়ে দেন। তাঁর ভয় অবশ্য কিছুমাত্র অমূলক নয়। এখন সব হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে—কাজেই রাত্তিরে হয়ত আমাদের খাওয়াই হবেনা। তিনি আমাদের কোনো নিষেধ না শুনে হোটেলে আমাদের তিন জনের ডিনারের ফরমাস করলেন। ওঁকে নিয়ে আমরা চার জন খেতে বসলাম। সেদিন খেতে খেতে ওঁর কাছে নানা রকম গল্প শুনে—ওঁর মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী নারী বাস করে তার সন্ধান পেলাম। মেয়েরা ঘরকে কেন্দ্র করে গল্প বল্‌তে এত ভালোবাসে! ওঁর ছেলে-মেয়ের কথা, স্বামীর কথা— নিজের খামখেয়ালীর কথা শোনাতে শোনাতে হাসি ও কৌতুকে উপ্‌ছে পড়ছিলেন মহিলাটি!

ইতিমধ্যে তাকিয়ে দেখি আমাদের পাশের টেবিলে এসে বসেছেন —কনফারেন্সে পূর্ব্ব-পরিচিতা—Womens' International Democratic Federationএর সভানেত্রী এবং বার্লিনের একটি

মেয়ে। তাঁদের সঙ্গেও অনেক আলাপ আলোচনা হল। ভারতের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের সভানেত্রী একটি শুভেচ্ছা ডাক যোগে পাঠিয়ে দেবেন—এই কথা তিনি আমায় জানালেন।

সে দিন রাত্রে আমরা মিসেস্ ওয়াদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন ভিয়েনার নিশুতি পথে পা দিলাম তখন নিকটবর্ত্তী গির্জায় বারোটা বাজে !

একদিন গেলাম—একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। ইউরোপের ছেলেমেয়েদের যে রকম বিজ্ঞান-সম্মত-পন্থায় চিকিৎসা করা হয়—সেটা চোখে দেখ্‌তেও এত ভালো লাগে ! আমাদের দেশের নামকরা হাসপাতালগুলিতে যদি সেই ভাবে চিকিৎসার নিয়ম প্রচলিত হয় তবে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে যাবে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে—ইউরোপের বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার পন্থা প্রচলন করতে যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন আমাদের গরীব দেশ সেটা সংগ্রহ করতে পারবে না। সরকারের এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তবু আমাদের দেশের ধনীরা যদি মুক্ত-হস্তে দান করেন তবেই এই জাতীয় বিজ্ঞান-সম্মত শিশু-চিকিৎসাগার খোলা যেতে পারে। সরকার যদি অন্যান্য বিভাগের অযথা ব্যয় কমিয়ে এইদিকে দৃষ্টিপাত করেন তবে বেশ কিছুটা সংগঠনমূলক কাজ হতে পারে। বিদেশে বহুসংখ্যক শিশু-চিকিৎসক পাঠিয়ে তাঁদের যথাযোগ্য ভাবে শিক্ষা দিয়ে আনাও সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

ইউরোপের ছেলেমেয়েদের কি রকম রদ্দুরে নিয়ে শরীরে সূর্যের তেজ লাগানো হয় সে দৃশ্যও দেখ্‌বার মতো। আমাদের দেশেও ঠাকুমা-দিদিমারা প্রচুর সরষের তেল মাখিয়ে ছেলেমেয়েদের রদ্দুরে ফেলে রাখেন। তাঁদের মুখে প্রায়ই শুন্‌তে পাওয়া যায়—তেলে-

জলে শরীর। সূর্য্যের তেজ বহু রোগের জীবাণু নষ্ট করে দেয়—একথা আজ বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমারা এই নিয়ম কিন্তু বংশ পরস্পরায় পল্লী অঞ্চলে চালু রেখেছেন।

ওদেশের হাসপাতাল এত ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে পরিষ্কার যে ধারণা জন্মে—দেবালয়ের মতো পবিত্র মনে করে সেগুলি সব সময় সকল গ্লানি মুক্ত করে রাখা হয়। সত্যি, একটি সুন্দর দেবালয়ে প্রবেশ করলে মন যেমন পবিত্র হয় তেমনি মনোভাব হয় ইউরোপের একটি হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঢুক্‌লে। ওরা মাটির মানুষকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করবার মন্ত্র গ্রহণ করেছে।

ভিয়েনার পথে-ঘাটে ভিক্ষুক বিশেষ চোখে পড়েনি। একদিন দেখ্‌লাম, একটি পার্কের ধারে একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক চৌকো ধরণের একটি বড় বাক্স বসিয়ে হাতল দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তার ভেতর থেকে নানা রকম গৎ শোনা যাচ্ছে। এই হচ্ছে তাদের ভিক্ষা করবার প্রথা। মুখ ফুটে কিছু চাইছে না। যার যা খুশী দাও।

ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বোমার আঘাতে ধ্বংস বাড়ীঘর দোর চোখে পড়ে। একটা যুদ্ধে ছোটরা যে কি রকম নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে সেটাও চোখ মেলে দেখা যায় এবং আমাদের সম্মেলনেও সেকথা নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়।

রাশিয়ার ছেলে-মেয়েদের একটি উৎসব দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমাদের দেশের বিভিন্ন কিশোর-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যাই—তাই বিদেশী ছেলে-মেয়েদের উৎসব, নাচ-গান প্রভৃতি দেখ্‌বার কৌতূহল বড় কম ছিল না।

অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল—ভিয়েনার সেই বিখ্যাত মিউজিক হলে। আমন্ত্রণ লিপি একটি পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছুতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহ একেবারে পূর্ণ। নীচে—ন স্থানং তিল ধারণং। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যখন জান্‌তে পারলেন যে, আমি সুদূর ভারতের লোক তখন বিশেষ যত্ন করে পেছনকার দরজা দিয়ে আমায় ঢুকিয়ে একেবারে লিফ্‌টে করে সোজা ওপরে নিয়ে এলেন। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি আসন আলাদা করে রাখা হয়েছিল। আমার বরাত ভালো—সেই একটি আসনে স্থান পেলাম। পানামার একটি নিগ্রো মহিলাও আমার মতো দেরী করে এসেছিলেন—তাঁর স্থানও হল আমার পাশে। নিগ্রো মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর নাম—জেলিসিয়া স্যানটিঙ্গস্। এমন ভরাট ও জমজমাট প্রেক্ষাগৃহ আমি আর কখনও দেখিনি। কয়েক হাজার লোক সেখানে স্থান পেয়েছিল—কিন্তু তবু এত চুপচাপ যে ছুঁচটি পড়লেও বুঝি তার শব্দ শোনা যাবে! মঞ্চটিকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। একটি কিশোরী মেয়ে এসে এক একটি বিষয়ের ঘোষণা করে যাচ্ছিল আর সুরু হচ্ছিল অনুষ্ঠান। এই উৎসবে মাইকের ব্যবস্থাটি দেখ্‌লাম একটু অন্যরকম। মঞ্চের বাইরে প্রেক্ষাগৃহের ঠিক সাম্‌নে দর্শকদের মাথার ওপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে লম্বা ধরণের মাইকগুলি। ওদিকে মঞ্চে হয়ত এক সঙ্গে একশ-দেড়শ ছেলে-মেয়ে গান গাইছে —এই বিশেষ মাইকগুলি তখন চালু রয়েছে। গানের প্রত্যেকটি কথা চমৎকার ভাবে শোনা যাচ্ছে—এতটুকুও জড়িয়ে যাচ্ছে না। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে নিয়মনিষ্ঠা (Discipline) ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি—সেটা কোনো দিনই ভুল্‌তে পারবো না। দলে দলে ছেলে-মেয়ে মঞ্চে এসে ঢুক্‌ছে

—কি সুন্দর তাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের কায়দা, কি অপরূপ তাদের স্বাস্থ্য—সব কিছুকে জড়িয়ে মনে হয় যেন নিপুণ শিল্পীর আঁকা পটের ছবি দেখ্‌ছি।

ওদের নাচ কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে একেবারেই মেলেনা। যেন ব্যায়ামের কসরৎ ও নাচকে একসঙ্গে মিশিয়ে একটা নতুন ধরণের ড্রিল তৈরী করা হয়েছে। তাতে সমবেত ব্যায়ামের অভিনব কলা-কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু নৃত্যের সহজাত লালিত্যের একান্ত অভাব। অবশ্য অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যেকটি যে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় সে বিষয়ে কারো দুইমত থাকতে পারে না।

যখন কোন বিশেষ গান কিম্বা নাচ দর্শকবৃন্দের ভালো লাগে তারা এমন সমবেত ভাবে হাততালি দিতে সুরু করেন যে, সারা প্রেক্ষাগৃহ গম্‌গম্ করতে থাকে। এই হাততালি বহুক্ষণ ধরে চলে। হাততালি যখন কিছুতেই থাম্‌তে চায় না—তখন যে শিল্পীদল গান কিংবা নাচে অংশ গ্রহণ করেছিল তারাও মঞ্চের সম্মুখে এগিয়ে আসে এবং দর্শকদের সঙ্গে হাত তালিতে যোগদান করে এবং সেই সমবেত হাত তালিতে কানের পর্দ্দা ফেটে যাবার উপক্রম হয়! এই অনুষ্ঠানে মঞ্চের উপর প্রায় দেড়শ থেকে দুশ চেয়ারও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের সাহায্যে সুন্দর খেলা দেখানো হয়। কোনো বিশিষ্ট অতিথিকে মালা দেওয়ারও একটা বিশেষ প্রথা আছে। প্রথমত সেই অতিথিকে মঞ্চে হাত ধরে নিয়ে আসা হয়। একজন তার পরিচয় মাইকের সাহায্য ঘোষণা করে দেয়, তারপর একদল মেয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মাল্যদান করে। সেই বিশেষ অতিথিটি তখন অবনত মস্তকে প্রেক্ষাগৃহের সোল্লাসধ্বনির উত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনেক রাত্তিরে যখন উৎসব শেষ হল—তখন কী হাততালির ধূম। যেন হাততালি দিয়েই ওরা অনুষ্ঠানটিকে জিয়িয়ে রাখ্‌তে চায়। ভিয়েনার রাজপথে তখন প্রচণ্ড শীত নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি ওভার-কোটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

এইবার একটি মজার গল্প শোনাই। ইউরোপের ভূতের গল্প বল্লে লোকে ত' হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমি একদিন গভীর রাত্রে লম্বা ভুতের মতো কি একটা দেখেছিলাম। সেই কাহিনীটি বল্‌ব। আমি যে হোটেলে থাক্‌তাম তার নাম—হোটেল "ষ্টাড্‌ ট্রিয়েষ্ট্‌"। এই হোটেলের ২০ নং ঘর আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঘরের সামনে দিয়ে লম্বা টানা বারান্দা চলে গেছে, তাতে কার্পেট পাতা। সেই বারান্দার দুইপাশে সব ঘর—মাঝখানকার ওই টানা বারান্দায় মাঝে মাঝে আলো জ্বল্‌ছে। একদিন একটু বেশী রাত্তিরে কি একটা অনুষ্ঠানের পরে হোটেলে ফিরেছি। হোটেলের প্রত্যেক ঘরের পৃথক চাবি থাকে—হোটেল থেকে বেরুবার সময় সেটি পোর্টারের হাতে জমা দিয়ে যেতে হয়—আবার হোটেলে ফিরে সেই চাবি চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুক্‌তে পারা যায়। যে সময় বোর্ডাররা ঘরে থাকেন না তখন পরিচারিকা কামরায় ঢুকে ঘর গুছিয়ে, বিছানা পেতে দিয়ে আসে। আমিও যথারীতি ঘরের চাবি পোর্টারকে জমা দিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে চাবি চেয়ে নিয়ে গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে ওপরে উঠে এলাম। অত রাত্তিরে লিফ্‌ট আর ব্যবহার করিনি। সারা হোটেল তখন ঘুমে অচৈতন্য—সব ঘর বন্ধ—কেউ কোথাও জেগে নেই। আমার ঘরের সাম্‌নেকার টানা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মনে হল—একটা বিরাট লম্বা লোক সট্‌ করে সরে গেল। আমি অবাক হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এত দীর্ঘ একটা লোক এলই

বা কোত্থেকে—আর সে চট্ করে সরেই বা গেল কোথায়? শেষ কালে ভাব্‌লাম—যুদ্ধের সময় এখানকার বহু লোক ত' অপঘাতে প্রাণ হারিয়েছে—তারই কেউ হয়ত বিলিতি-ভূত হয়ে এই হোটেলে নিশীথ রাতে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

যাই হোক মনে বল আন্‌বার জন্যে আবার গুণ্-গুণ করে গান গাইতে গাইতে ঘরের চাবি খুলে ভেতরে ঢুক্‌লাম। ভয় যে পেয়েছিলাম সে কথা বলা চলে না; তবে হঠাৎ অবাক হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—একথা অস্বীকার করতে পারবো না।

একদিন একটা হোটেলে ছোট্ট একটি টেবিলে বসে একা লাঞ্চ খাচ্ছি। আমার সাম্‌নের সিট্‌টি খালি। হঠাৎ একটি তরুণী এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখানে বস্‌তে পারি? আমি জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই। তরুণী একটি অফিসে চাকরী করেন। টিফিনে লাঞ্চ খেতে এসেছেন। বল্লেন, এই হোটেলে আমি রোজ লাঞ্চ খাই—এদের খাবার ভালো। কি কি খাবার এরা ভালো রান্না করে সে বিষয়ে তরুণীটি আমায় উপদেশ দিলেন। তিনি একথাও জানালেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি চাকরী নিয়ে এশিয়া অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং চীন ও ভারতবর্ষে কিছুকাল কাটিয়ে এসেছেন। মেয়েটি খুব আলাপী। অল্পক্ষণের ভেতরই আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে তুল্‌লেন। ভারতবর্ষ যে তাঁর ভালো লেগেছে একথা সুদূর ভিয়েনাতে বসে একজন বিদেশিনীর মুখে শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম এবং তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভিয়েনার অপেরা পৃথিবী বিখ্যাত। আগেকার দিনে বসন্ত সমাগমে—ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায় ভিয়েনায় এসে ভীড় করতেন এখানকার সৌন্দর্য্য আর অপেরা উপভোগ করবার জন্যে। ইউরোপীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয়—রাশিয়ার জার, জার্ম্মাণীর কাইজার,

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, ইংলণ্ডের রাজা অনেকেই আসতেন এখানে বসন্ত যাপনে উদ্দেশ্যে—এমনি ছিল পুরাকালে ভিয়েনার মোহ। ভিয়েনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন মনোরম তেমনি ভিয়েনার সুন্দরীও নাকি পৃথিবী বিখ্যাত।

এই ভিয়েনা শহরের অপেরা দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল। কিন্তু যখন কোনো সঙ্গী-সাথী জুটল না—আমি স্থির করে ফেল্লাম নিজেই যাবো অপেরা দেখ্‌তে। কেন না—ভিয়েনাতে এসে যদি জগদ্বিখ্যাত অপেরা উপভোগ করে না যাই তবে চিরজীবন একটা ক্ষোভ থেকে যাবে।

হোটেল থেকে ফোন করে ব্যবস্থা করে ফেল্লাম।

অপেরা হাউসে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম—তখন অভিনয় সুরু হতে আর বেশী বিলম্ব নেই। দলে দলে—সুবেশা নারী ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ এসে প্রেক্ষাগৃহে ঢুক্‌ছেন, অনেকে ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। আমার সিট্ ফোনে রিজার্ভ করা ছিল। যথারীতি দর্শনী দিয়ে ও টিকিট সংগ্রহ করে ভেতরে এসে ঢুক্‌লাম। প্রেক্ষাগারটি খুব ঝক্‌মকে না হলেও সুরুচি সম্মত—এবং প্রাচীনতার ছাপ বহন করছিল। ওপর নীচ সব জড়িয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রায় হাজার আসন আছে বলে মনে হল।

এদিনকার গীতি-নাট্যটি ছিল—দুটি পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। এক বাড়ীর ছেলে আর এক বাড়ীর মেয়ে তাদেরই মন-দেয়া-নেয়ার কাহিনী। অপেরা বলতে যা বোঝা যায় এ নাটকখানি ঠিক তাই। সংলাপ সাধারণ ভাবে না বলে আগাগোড়া গানের ভেতর দিয়ে চালানো হয়েছে। বাড়ীর কর্ত্তা থেকে সুরু করে দাসী পর্য্যন্ত সবাই গান গাইছে—আর সে গান তারা এত চড়া সুরে গেয়ে চলেছে যে সারা প্রেক্ষাগৃহ গম্‌-গম্ করছে।

মঞ্চটি ঘূর্ণায়মান। দৃশ্যপট বদ্‌লানোর ব্যাপারে একটি অভিনবত্ব লক্ষ্য করলাম। আমরা কল্‌কাতায় রঙ্‌মহলের ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দেখি যখন দৃশ্য পরিবর্ত্তন করা হয়—সব আলো তখন নিভিয়ে দিয়ে রীতিমত অন্ধকার ফেলা হয়। কিন্তু ভিয়েনার ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দেখ্‌লাম—নাটকের পাত্রপাত্রী অভিনয় করছে—হয়ত তারা একটি ঘরে বসে কথাবার্ত্তা বল্‌ছিল—তারা উঠে দাঁড়ালো বাইরে বেরুবে বলে; কিন্তু তাদের আর মঞ্চ ছেড়ে যেতে হল না। পুরো আলোর মধ্যে পেছনকার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল! দর্শক দেখতে পেল—ড্রইং রুম নদীর ধারে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আগেকার দৃশ্যের কিছুটা তুই পাশে সরে গেল—কিছুটা ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটাটাই একেবারে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার। সুইচ্‌ টিপে দিলেই হল। আর এই যে দৃশ্য-পরিবর্ত্তন সেটা অন্ধকার করে হয় না। একেবারে দর্শকবৃন্দের চোখের সাম্‌নে সব কিছু ঘটে থাকে। দর্শকবৃন্দ দেখল, যারা ড্রইং রুমে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল—তারাই নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যদিও কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কেন না—অভিনয়টি হচ্ছিল জার্ম্মান ভাষায়—তবু নাটকের বিষয়বস্তু বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। তা ছাড়া গানের সুর ও সেই সঙ্গে অভিনয়, অর্কেষ্ট্রা সকল দিক দিয়েই উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Music when soft voices die vibrates in the memory." সেদিনকার অর্কেষ্ট্রা শুনে বার বার সেই কথাই মনে হয়েছিল। কখনো সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত সুর-ধারা বন্যার মতো তুকূল প্লাবিত করে দর্শকের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল··· আবার কখনো সেই সুর অতি মৃদুভাবে কানে-কানে কথা বলার মতো—দক্ষিণ সমীরণের মতো—মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের সে কী করতালি ধ্বনি! সঙ্গীতের প্রভাব যে কতখানি—তা যেন সারা মন দিয়ে অনুভব করতে পারছিলাম। পুরীর সমুদ্রে স্নান করার মতো। কখনো ঢেউয়ের দোলায় তিন তলার মতো উঁচুতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—আবার পর মুহূর্ত্তেই সাঁ করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বেলভূমিতে!

অভিনয় শেষ হয়ে গেলেও সুরের ধারা মনে ঝঙ্কার তুল্‌তে লাগলো।

অভিভূতের মতো প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি যে অঞ্চলে ফিরে আস্‌বো তার ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছি, কিন্তু ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য লাইনের ট্রাম কিন্তু তখনো চল্‌ছে। পরে আসল খবরটা জানা গেল। তখন বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে ফিরে আসি।

সেদিন রাত্রে তন্দ্রার ঘোরেও ভিয়েনার অর্কেষ্ট্রার মূর্চ্ছনা শুনতে পেয়েছিলাম।

একদিন দুপুরবেলা একটি লাঞ্চ খেতে গিয়ে কি রকম কৌতুকজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই ঘটনা বল্‌ছি। আমার সঙ্গে ছিলেন অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ ধ্রুবরঞ্জন সরকার। দু'জনে গিয়ে ত ঢুক্‌লাম একটি হোটেলে। অন্যান্য খাবার খাওয়ার পর মুখ বদ্‌লানোর জন্য চাওয়া গেল—মিষ্টি কোনো খাবার। খাবার পরিবেশনকারিণী দুধে সেদ্ধ করা ভাত (পায়েসের মতো) আর সেই সঙ্গে মিষ্টি জেলি এনে হাজির। তখন ত আর ফেরৎ দেবার উপায় নেই। তাই দুজ'নে মেখে নিলাম। আমি বল্লাম, মন্দ কি? ইউরোপে বসে দিব্যি পায়েস খাওয়া চল্‌ছে। ওখানকার দুধ কিন্তু খুব খাঁটি। খেতে মন্দ লাগলো না। কিন্তু ডাঃ সরকার কিছুই

খেতে পারলেন না। সব ফেলে দিয়ে পালিয়ে এলেন। একদিন এক হাসপাতালের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেতে গেলাম তু'জনে। বোতলে জমানো খাসা দৈ পাওয়া গেল। মাত্র নয় আনা পড়ল। এক বোতল খেলে একেবারে পেট ভরে যায়। দৈয়ের স্বাদও খুব ভালো ছিল। আমাদের জলযোগের দৈ তার কাছে এগুতে পারে না। অথচ এক বোতল দৈয়ের দাম আমাদের দেশে অনেক বেশী পড়বে। সেদিন দৈয়ের সঙ্গে নরম পাউরুটি খেতে খুব ভালো লেগেছিল।

ভিয়েনাতে 'ইণ্ডিয়া লিগেশন' অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন—শ্রীরাম স্বামী। একদিন সেই অফিসে বেড়াতে গেলাম। ঢুকেই বারান্দাতে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখে সেই বিদেশে এত ভালো লাগলো! মনে হল যেন কোনো আত্মীয়কে খুঁজে পেয়েছি। রামস্বামী সেদিন অফিসে ছিলেন না। কোথায় টুরে গিয়েছিলেন। তাঁর সহকারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আমাদের আলাপ হল। বেশ ভদ্রলোক ও আলাপী মানুষ। আমাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। তাঁর কাছ থেকে যথাযোগ্য সদুত্তর পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষ থেকে কয়েকজন তরুণ ডাক্তার ভিয়েনাতে গেছেন—চিকিৎসা বিদ্যায়—বিশেষ করে অস্ত্রোপচারে পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে। তার ভেতর বাঙালী ডাক্তারও আছেন। একদিন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল। এই মধুর স্বভাব তরুণদের সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভালই লাগ্লো। তাঁরা চিকিৎসা বিদ্যায় খ্যাতি লাভ করে যখন দেশে ফিরে আস্বেন—ভারতের উপকার হবে বলেই আমরা আশা করতে পারি।

ভিয়েনার যে অধ্যাপকের সঙ্গে ট্রেণে আলাপ হয়েছিল এবং

যিনি তাঁর বাসায় যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—একদিন তাঁর ওখানে যাওয়া গেল। কিন্তু অধ্যাপক বাসায় ছিলেন না। তাই তাঁর নামে একটি চিরকুট রেখে চলে এলাম। সেই চিরকুট পেয়ে অধ্যাপক আবার আমার হোটেলে ফোন করলেন। তিনি বাসায় ছিলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং আর একদিন তাঁর ওখানে যেতে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু চারদিকের ছুটোছুটিতে আমি সময় করতে পারিনি বলে অধ্যাপকের গৃহে আর যাওয়া হয় নি। এই অধ্যাপকের গৃহ ইণ্ডিয়া লিগেশন অফিসের কাছে।

সুযোগ পেলে যে বিদেশীকে অনেকে ঠকাবার চেষ্টা করে এবার তারই একটা উদাহরণ দেবো। একদিন আমাদের হোটেলের পোর্টার কোনো কাজে অন্যত্র যায় এবং তার এক আত্মীয়কে অফিস ঘরে বসিয়ে রাখে। এই সময় ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ ধ্রুবরঞ্জন সরকার আমায় একটি জরুরী কাজে ফোন করেন। ফোনে কথা কয়ে যখন নিজের ঘরে চলে আস্‌ছি তখন সেই পোর্টারের আত্মীয় আধা বুড়ো ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে বল্লেন যে, আমাকে ফোনের চার্জ্জ দিতে হবে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চার্জ্জ কিসের? আমার একটি বন্ধু আমায় ফোন করেছেন নিশ্চয়ই তিনি চার্জ্জ দিয়েই ফোন করেছেন। ফোন যিনি পান তিনি চার্জ্জ দিতে যাবেন কোন নিয়মে? এতে সেই বুড়ো ভদ্রলোক বলেন যে, আমাদের হোটেলে নিয়ম আছে। আমি বুঝ্‌তে পারলাম যে, আসল ব্যক্তির সাময়িক অনুপস্থিতিতে এই বৃদ্ধ একটু উপরি লাভ করতে চায় বিদেশীর কাছ থেকে। আমি জবাব দিলাম, কোনো দেশে এ নিয়ম নেই এবং এজন্য আমি এক পয়সাও দেবো না। আমার উত্তর শুনে বৃদ্ধটি একেবারে দমে গেলেন!

নেতাজীর স্ত্রী-কন্যার কাহিনী

দিনটি ছিল রোববার।

তার আগের দিন বিকেল পাঁচটায় ভারতীয় প্রতিনিধি দল "কাফে কাইসার গার্টেনে" নেতাজী সুভাষ বসুর সহধর্মিণীর সঙ্গে একটি ঘরোয়া চায়ের মজ্‌লিসে মিলিত হন। সেই সন্ধ্যায় সাধারণ ভদ্রতাসূচক আলাপ আলোচনা চলে। তাতে কিন্তু আমার মন ভরে না। তাই বিদায় নেবার সময় বল্লাম, আমি কিন্তু নেতাজীর মেয়ে অনিতাকে দেখতে চাই, আলাপ করতে চাই, আর চাই ভাব জমাতে। ছোটদের সঙ্গে আসর জমানোই যে আমার কাজ। শ্রীমতী বসু মৃদু হেসে সম্মতি দিলেন এবং বল্লেন, পরদিন রোববার দুপুর দুটোয় যেন আমি তাঁদের বাসায় যাই। আমার নোট বুকের পাতায় নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিলেন।

নেতাজীর কন্যা—সে ত' ভারতবর্ষেরই ঘরের মেয়ে—আমাদের আপনার লোক—তাকে আরো আপনার করে নিতে হবে,—"সব পেয়েছির আসরের" সোনারকাঠি করে নেবো তাকে—এই আশা-আকাঙ্ক্ষায় রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

সকালবেলা জান্‌তে পারলাম, আমাদের বোম্বের প্রতিনিধি মিসেস্ ওয়াদিয়া আজ চলে যাচ্ছেন। তাঁকে যথাসময়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তৈরী হলাম—শ্রীমতী বসুর বাসায় রওনা হবার জন্যে।

ভিয়েনার ট্রামে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা থাকে। কোন্ ট্রামে যেতে হবে, সে কথা আগের দিন শ্রীমতী বসু আমায় ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলেন। টেলিফোন নম্বরও লিখে দিয়েছিলেন আমার খাতায়। একবার ভাবলাম, রওনা হবার আগে টেলিফোন করে যাই! কিন্তু এনগেজ্‌মেণ্ট ত' হয়েই আছে। তাই

তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়লাম। ট্রামে উঠ্‌লাম বটে, কিন্তু কোথায় নামতে হবে আমার জানা ছিল না! ট্রামের কণ্ডাক্টারকে জানিয়ে রাখ্‌লাম সে কথা। কণ্ডাক্টার লোক ভালো। সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে বল্লে, ঠিক যায়গায় নামিয়ে দেয়া হবে।

ট্রাম ছুটে চলেছে আর আমি শুধু ভাব্‌ছি—অনিতা এখন কত বড়টি হয়েছে, দেখতে কেমন হয়েছে—তার বাবার মতো হয়েছে কিনা, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে, আমাদের দেশে যাবার আগ্রহ তার আছে কি না—এই সব কথা।

হঠাৎ চম্‌ক ভাঙলো ট্রামের কণ্ডাক্টারের কথায়। চেয়ে দেখি আমরা একটি টার্মিনাসে এসে পৌঁছে গেছি। কণ্ডাক্টার আমাকে নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল এবং বল্লে, চলুন—আপনাকে গলিটা চিনিয়ে দিয়ে আসি। আমি যাবো ফেরোগাসীতে। গলির মুখটা দেখিয়ে দিয়ে সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

নম্বর ধরে ধরে এগিয়ে চল্লাম। রবিবারের দুপুর, নির্জন রাস্তা, দুধারে বাড়ী আর মাঝে মাঝে লম্বা গাছ। আমি যে সংখ্যাটি চাই তা খুঁজে পেতেও বেশী বিলম্ব হল না। দরজায় কড়া নাড়লাম। একজন এসে দরজা খুলে দিয়ে গেল। শ্রীমতী বসুর সাদর আহ্বান কানে এলো—ভেতরে চলে আসুন।

ঢুকেই দেখি—বারান্দা পেরিয়ে ছোট্ট একটি পরিষ্কার উঠোন। ওধারে একটি সুন্দর নির্জন বাগান। সেই বাগানের একটি গাছের তলায় একটি বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁদের দেখেই চিনতে পারলাম—অনিতার দিদিমা, অনিতার মা—আর অনিতা। শ্রীমতী বসুর সঙ্গে ত' আগের দিনই আলাপ হয়েছিল। তিনি এগিয়ে এসে সাগ্রহে কর-মর্দ্দন করলেন এবং নিজের মা

ও মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা যে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন—সে কথা জানালেন।

ওদিকে চেয়ে দেখি অনিতা আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে! ভাব করবে না আড়ি করবে সেটা বোধ করি ঠাহর করতে পারছে না। আমি ওকে আদর করে কোলের কাছে টেনে নিলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কপালের খানিকটা, চোখ, নাক আর ঠোঁট একেবারে সুভাষচন্দ্রের মতো; ভাবলাম, আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমার মুখে একটি কথা শোনা যায়—"পিতৃমুখী কন্যা সুখী হয়।" তাই হোক, মনে মনে এই কামনা জানালাম।

শ্রীমতী বসু ততক্ষণে আমায় নিয়ে লম্বা বারান্দায় বসিয়েছেন। মাঝখানে একটি বড় টেবিল পাতা। তার চারপাশে আমরা চারজনে বস্‌লাম। দুপুর বেলায় এতটা পথ আসায় আমার তেষ্টা পেয়েছিল। আমি শ্রীমতী বসুর কাছে এক গেলাস খাওয়ার জল চাইলাম। তাতে অনিতার দিদিমা কি যেন বলে উঠ্‌লেন—তাঁর মাতৃভাষায় (জার্মাণ)। উনি কি বল্‌ছেন জিজ্ঞেস করতে অনিতার মা উত্তর করলেন, মা বল্‌ছেন, আপনার জন্যে খাবার, কফি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা আছে। শুধু শুধু জল কেন?

জবাবে আমি হেসে বল্লাম, জল চাইছি আমি তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, সুতরাং সেইটিই আগে মঞ্জুর হোক।

অনিতার মা আমার কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আদেশে তৃষ্ণার জল নিয়ে এলো ছোট্ট মেয়ে অনিতা। নেতাজীর মেয়ের হাতের ঠাণ্ডা জল পেয়ে যে আরো মিষ্টি লাগ্‌লো সে কথা ত' তোমরা না বল্লেও বুঝে নিতে পারবে।

আমরা কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম ইংরেজীতে। অনিতার মা এত ভালো ইংরেজী বলেন যে, না বলে দিলে বোঝবার যো নেই যে, তাঁর মাতৃভাষা জার্মাণ। কিন্তু অস্থবিধে হচ্ছিল—অনিতার দিদিমার। তিনি ক্রমাগত শ্রীমতী বস্থকে প্রশ্ন করছিলেন, আমি কি বলছি জানবার জন্যে। শেষকালে ঠিক হল—আমরা ইংরেজীতেই কথা-বার্তা চালিয়ে যাবো—আর অনিতার মা দোভাষীরূপে আমাকে ও অনিতার দিদিমাকে আমাদের পরস্পরের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবেন। এই ভাবেই তখন এগিয়ে চল্লো আলোচনা।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমতী বস্থ বল্লেন, রবিবারটা আমরা মোটেই বাসায় থাকিনে। অনিতাকে নিয়ে সোজা চলে যাই—কোনো গ্রামে বা কোনো পাহাড়ের ধারে, কিম্বা কোনো ঝরণা-তলায়। সেইখানেই আনন্দের ভেতর দিয়ে সারাটা দিন কাটে। সঙ্গে থাকে খাবার। আবার সন্ধ্যেবেলা তিনজনে ঘরে ফিরে আসি।

আমি দুঃখ প্রকাশ করে উত্তর করলাম, তা হলে ত' আপনাদের একটা রোববারের আনন্দ মাটি করে দিলাম।

—না-না, তা কেন? জবাব দিলেন শ্রীমতী বস্থ। আপনার সংগে ঘরোয়া আলাপ করেও কি আমরা কম আনন্দ পাবো? তা ছাড়া আপনি অনিতাকে দেখতে চেয়েছেন! তাতেও ত আমাদের খুশী হবার কথা।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে দেখি—অনিতা তখনো অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। নতুন মানুষ, আলাপ জমিয়ে তুলবে কিনা এখনো ঠিক করে উঠ্‌তে পারে নি! কতই বা ওর বয়েস হবে? জিজ্ঞেস করলাম ওর মাকে। এই নয় বছর চলছে অনিতার। আদর করে ওকে আমার কাছে টেনে নিলাম। এইবার কৌতূহলের কুয়াসা বোধ করি কেটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে ভাব জমাবার

জন্যে অনিতা এগিয়ে এলো, আদর করে কোলে তুলে নিলাম ওকে। ভিয়েনার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য যে রকম ভালো, অনিতার কিন্তু তা নয়। মনে হয় যেন একটু রোগা। আর একটু মোটাসোটা হলে বোধ করি ভালো লাগতো।

কানে-কানে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? অনিতা জবাব দিল, ক্লাস ফোর।

শ্রীমতী বসু বল্লেন, মাতৃভাষার সঙ্গে ও একটু একটু ইংরাজীও শিখ্ছে। আমার সঙ্গে অবশ্য ও ইংরাজীতেই কথা বলতে লাগলো। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজী বেশ মিষ্টি শোনালো অনিতার মুখে।

ওর আসল নাম ANITA (এ্যানিটা), কিন্তু আমি বাংলা করে নিয়ে সোজাসুজি নামকরণ করে বস্‌লাম 'অনিতা'। তাতে অবশ্য ওঁদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি উঠল না।

আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা অনিতা, কি কি বিষয় তোমার ভালো লাগে?

জবাব এলো—সেলাই, ইতিহাস আর ভূগোল।

—ইতিহাসটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়বে। জান্‌বে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের ভারতবর্ষের কথা। তোমার পিতৃভূমির কথা। আর সব সময় মনে রাখবে—কত বড় বাপের মেয়ে তুমি। অনিতা ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালে।

কিন্তু অনিতার মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, বড় বাপের মেয়ে এইটেই ত' জীবনে একমাত্র গর্ব থাকা উচিত নয়! বরং আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন যেন ও নিজে মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি শ্রীমতী বসুর চোখে-মুখে একটা স্থির সঙ্কল্প······একটি নীরব-তপস্যার স্ফুলিঙ্গ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

অনিতার মাথায় আমি হাত রাখলাম। মনে মনে হয়ত সেই কামনাই করলাম যে, অনিতা মানুষ হয়ে যেন তার পিতৃভূমিতে ফিরে যায়। তার পিতার মহান আদর্শ—দেশকে গড়ে তোলবার বিরাট দায়িত্ব যেন সে গ্রহণ করে।

আমাদের কথাবার্তা যেন ক্ষণিকের জন্যে দুঃখে ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই আবহাওয়াটাকে হালকা করবার জন্যে বলে ফেল্লাম, জানেন মিসেস বোস, নেতাজী প্রতিষ্ঠিত বাঙলা দৈনিক কাগজ "বাঙলার কথা"-তেই প্রথম আমার সাংবাদিক জীবনের হাতে-খড়ি হয়! তখন তিনি নেতাজী হননি, ছিলেন—বাঙলার আদরের সুভাষচন্দ্র। সে আজ কতকালের কথা!

আলোচনার মোড় ঘুরে গেল....শ্রীমতী বসু আনন্দ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতার স্বাস্থ্য এখন কেমন? বিভিন্ন ঋতুতে কলকাতার উত্তাপ কেমন থাকে?

আমি "ফুল্লরার বারোমাসী"র মতো কলকাতার ছয় ঋতুর ব্যাখ্যা করলাম। তিনি ভয় পেয়ে কৌতুক করে হাসতে হাসতে বল্লেন, ওরে বাবা! তা হলে আমি কখনো কলকাতায় যাচ্ছিনে।

আমি প্রশ্ন করলাম, কেন যাবেন না শুনি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি ভিয়েনার মেয়ে, ভিয়েনাতে জন্মেছি, চিরকাল ভিয়েনাতে আছি, আর ভিয়েনাতেই মরতে চাই। একটা বিষণ্ণভাব যেন তাঁর চোখের ওপর ছায়া ফেলল। আমি সে সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো প্রশ্ন তাঁকে করলাম না। অনিতাকে উপলক্ষ করেই আলোচনা তখন গড়িয়ে চল্লো ছোটদের শিক্ষা নিয়ে। ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে কিনা তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি জানালাম যে, দেশবন্ধু যখন কলকাতার

মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা, তখন থেকেই এই প্রচেষ্টা চলছে বটে........কিন্তু সারা ভারতে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের এখনো যথেষ্ট দেরী আছে।

শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে, ইউরোপের সব দেশেই এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমাদের স্বাধীন দেশেও যে সে ব্যবস্থা আশু প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে, স্বীকার করতেই হল।

বিভিন্ন দেশের ছড়া, গান ও নাচ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলতে লাগলো। আমি ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের নাচ ও গানের কথা বল্লাম। ঠাকুমা-দিদিমার মুখে-মুখে কি জাতীয় ছড়া সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, তার উল্লেখ করলাম—আর ইতিপূর্ব্বে আমাদের "সব পেয়েছির আসরের" যে সংগঠনী ওঁদের উপহার দিয়েছিলাম—তাই খুলে আমাদের সোনারকাঠিদের নাচ-গানের কথা, ভারতের কিশোর-আন্দোলনের কথা সব বুঝিয়ে বল্লাম। আমাদের সংগঠনীর প্রচ্ছদপটের ওপর মেয়েদের যে ছবি আছে লক্ষ্য করে দেখলাম—অনিতার দৃষ্টি তা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

ইতিমধ্যে অনিতার দিদিমা কোন ফাঁকে উঠে গেছেন—আমি আদৌ লক্ষ্য করিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, এক বিরাট প্লেট ভর্তি নানা রকম পিঠে নিয়ে এসে তিনি টেবিলের মাঝখানে রাখলেন।

আমি আঁৎকে উঠে বল্লাম, এ আপনি করছেন কি? অনিতার মা হাসতে হাসতে বল্লেন, ভয় নেই। আসুন না, সবাই মিলে খাই। ওঁর এই আন্তরিকতা আমার খুব ভালো লাগলো। সবাই মিলে খাওয়া সুরু করে দিলাম। অনিতা প্রথমটা লজ্জা পাচ্ছিল—তাকেও কাছে টেনে নিলাম। খেতে খেতে আবার গল্প চল্লো।

আমি বল্লাম, বাঙলা দেশে এক রকম পিঠে আছে—তার নাম

'পাটি-সাপ্‌টা'—আপনাদের এইটি পিঠে কিন্তু অবিকল সেই রকম। শুনে অনিতার দিদিমা খুব হাসতে লাগলেন, আর আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, খাও-খাও-আরো খাও। লজ্জা কোরো না।

পিঠের সঙ্গে চলেছে—গরম কফি। এক কাপ ফুরিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে অনিতার দিদিমা আর এক কাপ ভর্তী করে দেন। কিন্তু আমি যে কফি-খোর মানুষ নই, সে কথা তাঁকে বোঝানো মুস্কিল। দূর দেশের অতিথির আপ্যায়নে তাঁকে বিশেষ তৎপর দেখা গেল।

অনিতাকে বল্লাম, ইস্কুলে তুমি কি কি বই পড়ো নিয়ে এসো—আমি দেখবো। উৎসাহে ও আনন্দে অনিতা ঝলমল করে উঠল। ছুটে গিয়ে সমস্ত বই এনে আমার কোলের ওপর ফেলে দিলে। তারপর আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো কোনটা কি বই! পাতা উল্‌টে-উল্‌টে দেখাতে লাগলো তার নানা রকম মজাদার ছবি।

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে আমি শ্রীমতী বসুকে জিজ্ঞেস করলাম, সারা দিন আপনার কি রকম করে কাটে? বলুন না। আমার শুনতে ভারী ইচ্ছে করছে। অনিতার মা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বল্লেন, আচ্ছা, তা হলে শুনুন। এই ছোট্ট অনিতাকে কেন্দ্র করে আমাদের তিনজনের সংসার। আমাকে অফিসে চাকরী করতে হয়। ফিরতে রাত নটা, দশটা—কোনো দিন এগারোটাও হয়ে যায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লাম, তা হলে ত' আপনাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়! ম্লান হেসে তিনি জবাব দিলেন, One should work hard to live! কি অব্যক্ত বেদনার কথা বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন আমি সেটা বেশ বুঝতে

পারলাম। দুঃখিত হলাম তাঁর মনের গভীরতম ক্ষতের কথা অজান্তে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি বলে!

আমাদের আলোচনার ধারাকে সহজ করে নেবার জন্যে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, এটা কি আপনাদের নিজের বাড়ী? কত দিন এখানে আছেন?

উত্তরে অনিতার মা বল্লেন, না-না, এটা আমাদের নিজের বাড়ী নয়। গত ৩৮ বছর ধরে এখানে আমরা আছি। আমার জন্ম থেকে এই বাড়ীতেই ত' রয়েছি। আর কোথাও উঠে যাবার কথা আমরা ভাবিনে। এই বাড়ীর সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই বাড়ীতে আমার বাবা ছিলেন—তাঁর খুব বইয়ের সখ ছিল। এখনো তাঁর হাতে-গড়া লাইব্রেরী রয়েছে এই বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই আপনাদের নেতাজী এসে বাস করতেন। ইউরোপের যুদ্ধ চলাকালে এই বাড়ীই ছিল তাঁর হেড-কোয়ার্টার। ঝড়ের মতো বেরিয়ে যেতেন কিছুদিনের মতো—জার্মাণী কি কোথায় কে জানে! তখনো জার্মাণীর সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ স্থুরু হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন মিঃ বোস—তারপর হঠাৎ একদিন আবার এই বাড়ীতেই ফিরে আসতেন।

শ্রীমতী বসু মুখ ফুটে না বল্লেও বেশ বুঝতে পারলাম, নেতাজী যখন অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন ভিয়েনার এই ছোট্ট স্নেহ-নীড়ে ফিরে আসতেন—সেবার আশায়, সাহচর্য্যের কামনায়, আর আসতেন অতি গোপনীয় ও জরুরী কাগজ-পত্র তৈরী করার প্রয়োজনে।

আমাদের ভারতের ইতিহাসে এই জাতীয় বৈদেশিক মহিলার সাহচর্য্য আর প্রেরণা ত' নতুন নয়! কবি মাইকেলের সহধর্মিণী হেনরিয়েটা কবির অতি বড় দুর্দিনে কবিকে প্রেরণা দিয়ে, সেবা

দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্যা নিবেদিতা বিদেশী মহিলা হয়েও ভারতের জনগণের সর্ববিধ মুক্তি-কামনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিদেশিনী মহিলা অ্যানি বেশান্ত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তা সকল রকম দেশের কাজে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন······এ সব কাহিনী আমরা ভুলবো কি করে? সান্ত্বনা এই যে, তাঁরা ভারতের সম্মান পেয়েছেন।

শ্রীমতী বসুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, এই বিদেশিনী মহিলা সেক্রেটারীরূপে নেতাজীর অতি গোপনীয় কাগজপত্র রচনায় সাহায্য করেছেন, পুস্তক প্রণয়ণে সকল রকমে সহযোগিতা করেছেন, স্ত্রীরূপে নেতাজীর অতি দুর্দিনে সেবা দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে প্রেম ও প্রীতি দিয়ে দূর বিদেশে আগলে রেখেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস্ যখন লিখিত হবে—এই "কাব্যে-উপেক্ষিতা" কি তাঁর প্রকৃত মর্যাদা পাবেন না? ভবিষ্যতের ইতিহাস প্রণেতার কাছে আমি শুধু সবিনয়ে প্রশ্নটি উল্লেখ করে রাখ্লাম।

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলাম আমি। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না।

সেই থম্থমে পরিবেশকে হাল্কা করে দিল, নেতাজীর মেয়ে অনিতা।

শুধোলে, আচ্ছা, ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের কথা বলো না। আমি তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বল্লাম, তার চাইতে তুমি বলো—তোমার জন্মদিন কোন তারিখে?

মনে মনে এই বাসনা রইল—তারিখটা জেনে রাখি। তারপর

ভারতবর্ষ থেকে সুবিধে মত ওকে জন্মদিনের উপহার পাঠিয়ে অবাক করে দেবো।

অমিতার মা বল্লেন—নয় বছর আগে ২৯শে নভেম্বর ও আমার কোলে এসেছিল। চুপি চুপি তারিখটা টুকে রেখে দিলাম আমার নোট বুকে।

হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা, সারা ভারতবর্ষ কিভাবে নেতাজীর জন্মদিন পালন করে আপনি কি তা জানেন? শ্রীমতী বসু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, বিশ্বাস করুন, সব খবরই আমি রাখি। এমন কি উৎসবের ছবি পর্যন্ত আমার কাছে আছে।

আমি ইতিমধ্যে অনিতার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছি, এবং অনিতাও হয়ত মনে মনে বিশ্বাস করেছে যে, লোকটা আমি নেহাৎ খারাপ নই! ওর ইস্কুলে কেমনভাবে লেখাপড়া শেখায়, ওর বন্ধু কে-কে, কি তাদের নাম……এইসব খবর নিতে আমি যখন ব্যস্ত তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি—কি কথা নিয়ে অনিতার দিদিমাতে আর তার মাতে কথা কাটাকাটি চল্‌ছে।

আমাকে নিয়ে কোনো ব্যাপার নয়তো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম, কি নিয়ে আপনাদের ঝগড়া চল্‌ছে……? আমি কি তার ভেতর নাক গলাতে পারি না? (May I pock my nose into it?) অনিতার মা হেসে বল্লেন, আমাদের মা-মেয়েতে ঝগড়া হচ্ছে—আপনাকে কোথায় বসালে আরামদায়ক হবে তাই নিয়ে। মা বল্‌ছেন আমাদের ড্রইং রুমে নিয়ে বসাতে। আর আমি বলছি—বারান্দার এই ঝিরঝিরে হাওয়াতেই ভালো। কেমন আমি ঠিক বলিনি?

অনিতার দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝ্‌লাম, তাঁর একান্ত

ইচ্ছে যে, আমি গিয়ে ভেতরে তাঁদের ড্রইং রুমে বসি। কাজেই চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, বারে! আপনাদের বাসায় বেড়াতে এলাম আর ড্রইং রুমে বসবো না? চলুন, সবাই মিলে সেইখানে বসে আসর জমিয়ে তুলি।

দিদিমা খুব খুশী হয়ে উঠে পড়লেন সবাইকার আগে। বাঃ! ছোট্ট গুছোনো ড্রইং রুমটি। একদিকে অনিতার দাদামশায়ের লাইব্রেরী অন্যটিকে বস্‌বার কৌচ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম।

অনিতা ছুটে এসে আমাকে শুধোলে, আচ্ছা, তোমার ছোট্ট মেয়ে আছে? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেল্লাম। বল্লাম, তোমার চাইতেও ছোট, তিন-চার বছর বয়েস।

—কি নাম বলো না।

—ছুটু।

তক্ষুণি ছুটে সে নিজের মায়ের কাছে চলে গেল। গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মায়ের কানে-কানে কি যেন বল্লে। আমি ব্যস্ত হবার ভান করে বল্লাম, আমার নামে অনিতা মায়ের কাছে নালিশ করছে না ত?

অনিতার মা মৃদু হেসে বল্লেন, না-না। ওর ইচ্ছে হয়েছে আপনার ছোট্ট মেয়েকে ও একটা গল্পের বই উপহার দেবে।

আমি লাফিয়ে উঠে বল্লাম, তাই নাকি? অনিতার দেয়া উপহার নিয়ে গেলে ত' আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা লোফালুফি সুরু করে দেবে।

মায়ের সম্মতি পেয়ে অনিতা ছুটে গেল—গল্পের বই নিয়ে আস্‌তে। তক্ষুণি বইটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরে এলো। আমি বল্লাম, তুমি যে বইটা দিচ্ছ তাতে কিছু লিখে দেবে না?

একেবারে গিন্নি-বান্নির মতো সে কলম নিয়ে লিখ্‌তে বসে গেল। তাকিয়ে দেখি সে লিখ্‌ছে "To little Chutu from Anita. vienna 20th of April 1952" ছোট্ট অনিতার স্নেহের দান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। এই ছবির বইখানার নাম "THREE TALES". বইখানাতে অনেক ছবি আছে। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বইখানার একটি লাইন জার্মাণ ভাষায় লেখা আর পরবর্তী লাইন ইংরেজীতে তারই অনুবাদ। এইভাবে গোটা বইটা ছাপা হয়েছে। অষ্ট্রীয়ার যেসব ছেলে-মেয়ে তাড়াতাড়ি ইংরেজী শিখ্‌তে চায় তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু বই দিয়েই অনিতা খুশী নয়, ভিয়েনা শহরের একটি ছাপানো কার্ড নিয়ে এলো। এইটি সে আসরের ছেলে-মেয়েদের উপহার দিলে। নিজের হাত লিখে দিলে "Best greetings from vienna Anita."

আমি বল্লাম, এই উপহার দেয়াতে আসরের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেল। তুমিও সব পেয়েছির আসরের সভ্যা হয়ে গেলে। তোমার কার্ড আমি কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবো। ভারতবর্ষ থেকে তার নামে কার্ড আস্‌বে জেনে অনিতা খুব খুশী।

শ্রীমতী বসু এইবার পৃথিবীর নানান্ দেশের রূপকথার আলোচনা সুরু করলেন এবং ভারতবর্ষের রূপকথা সম্পর্কে জান্‌তে চাইলেন। আমি বিষ্ণুশর্মা, ঈশপ ও হান্স আণ্ডারসনের গল্পের আলোচনা করে ভারতবর্ষের রূপকথার বৈশিষ্ট সম্পর্কে তাঁকে কিছু বল্লাম। বিষ্ণুশর্মার নাম উল্লেখ করতে তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে বল্লেন, আচ্ছা একটা বিষয় আপনার কাছে আমার জান্‌বার আছে। এক-মিনিট। তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে একটি ইংরেজী বই নিয়ে এলেন। ওটা হাতে দিতে দেখলাম বিষ্ণুশর্মার "পঞ্চতন্ত্রের"

ইংরেজী অনুবাদ। আমায় জিজ্ঞেস্ করলেন, পড়তে পড়তে একটা যায়গায় আমি আট্কে গেছি। আচ্ছা বলুন ত, 'গরুড়' মানে কি ? আমি জবাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতা এবং বিষ্ণুরই আর এক নাম নারায়ণ। নারায়ণের বাহন হচ্ছে গরুড়। গরুড় পাখীর বৈশিষ্ট্য কি সেটাও তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। মনে হল তিনি আমার ব্যাখ্যায় খুশী হয়েছেন।

কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, দেখুন, আমি প্রতিবেশী কারো সঙ্গে মিশি নে। কাজ আর লাইব্রেরী······এই নিয়েই আমার জীবন কাটে। ভারতবর্ষের কিছু কিছু রূপকথা যদি ইংরেজীতে তর্জমা হয়ে থাকে—তবে আমায় পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন ? আমি সানন্দে সম্মত হলাম। [কল্কাতা থেকে আমি কতকগুলো বই অনিতাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ইংরেজীতে অনুদিত ভারতবর্ষের রূপকথা এখনো ভাল রকম সংগ্রহ করতে পারিনি।]

শ্রীমতী বসুর লাইব্রেরীর মাথার ওপর একটি প্যাঁচার মূর্তি আছে। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্যাঁচাকে ভারতবর্ষের লোকেরা কি মনে করে ?

আমি উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষে লক্ষ্মী দেবী হচ্ছেন Goddess of Wealth, তার বাহন হচ্ছে প্যাঁচা। জ্ঞানের (Wisdom) প্রতীক রূপেও প্যাঁচা সর্বত্র আদৃত হয়ে থাকে। তিনি বল্লেন, কিন্তু কোনো কোনো দেশ মনে করে থাকে প্যাঁচা হচ্ছে Sign of foolishness ! আমি উত্তরে জানালাম, অন্ততঃ ভারতবর্ষে সেই মতবাদ প্রচলিত নেই। তবে কুনো লোককে কেউ কেউ প্যাঁচার সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকে বটে ! ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতার ব্যাখ্যা তিনি শুনতে চাইলেন। আমি আমার মনোমত ব্যাখ্যা তাঁকে শুনিয়ে দিলাম।

এক বিষয়ের পর আর এক বিষয়ের আলোচনায় আমরা এগিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। শিশুশিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, শেষকালে আমরা রাজনীতিতেও এসে পৌঁছুলাম। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগনের অনেক খবরই তিনি রাখেন। এই দেশের একটি ইংরেজী কাগজ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বল্লেন, ওই কাগজটা আমি রীতিমত পড়ি। কাগজটা তাঁর টেবিলের ওপর ছিল। সেই সঙ্গে আরো অনেক সাময়িক পত্রিকাও দেখলাম। নেতাজীর জীবিতকালে তিনি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক অঞ্চল থেকে আঘাত পেয়েছেন সেকথাও বেদনার সঙ্গে জানালেন।

বেলা ছুটো থেকে প্রায় ৪॥টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে আমাদের আলোচনা হল। শ্রীমতী বসু এত সুন্দর গল্প করতে পারেন যে, চুপচাপ বসে শুনতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশে অন্নপ্রাশনের উৎসব কেমন হয় সে সম্বন্ধে তিনি চমৎকার গল্প করলেন। একবার বসু পরিবারের কোন আত্মীয় ভিয়েনাতে ছিলেন। তাঁর এক সন্তানের মুখে ভাত হয়েছিল। পায়েস ইত্যাদিও রান্না হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় মতে। অন্নপ্রাশন-উৎসবে দেয়া সমস্ত সাজানো খাবার ভাগাভাগি করে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের খেয়ে ফেলতে হয় এবং সেই ব্যাপারে অনিতা যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল তিনি আমায় সে গল্পও শুনিয়ে দিলেন।

ভারতবর্ষে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছেন কিনা সেই আলোচনা করতে গিয়ে অনিতার মা আমায় জানালেন যে, তাঁদের পরিচিত ভিয়েনার এক ভদ্রলোক নাকি ভারতবর্ষে এসে সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করছেন!

বেলা পড়ে এলো। এখন আমায় বিদায় নিতে হবে। কিন্তু

আমার কৌতূহলের শেষ নেই। জানালাম, দেখুন, আর একটি কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করবো।

তিনি উত্তর করলেন, বলুন—

—নেতাজীর শেষ চিঠি আপনি কবে পেয়েছেন? এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

পাথরের মূর্তির মতো তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর করলেন, গত ১৯৪৩ সালে জাপান থেকে তিনি আমাকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি একবছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে ১৯৪৪ সালে ভিয়েনাতে আমার হাতে এসে পৌঁছোয়। তারপর আমি আর তাঁর কোনো খবরই পাইনি!

মনে হল এই খবরটি বলতে গিয়ে অসহ্য বেদনায় তিনি যেন নীল হয়ে গেলেন!

যখন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম অনিতার দিদিমা তাঁর মেয়ের মারফৎ আমায় অনুরোধ করলেন—আবার ভিয়েনায় আসতে। শ্রীমতী বসু বল্লেন, Mother gives her good wishes to your Family.

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অনিতাকে আদর করে যখন বাড়ী থেকে পা বাড়াতে যাবো—অনিতার মা হু'পা এগিয়ে এসে বল্লেন, আপনি হয়ত রাস্তা ভুল করে ফেলবেন, অনিতা আপনার সঙ্গে যাক।

সত্যি বিস্ময়ে আমার মাথা নত হয়ে এলো। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে এতখানি আপনার করে নিয়েছেন! আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তিনি আমার কোনো কথাই শুন্‌লেন না। মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। অনিতাও খুব উৎসাহী। আমার সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বল্লে, চলো, তোমায় একেবারে ট্রামে বসিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

অনিতার ছোট্ট হাতখানি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে পথ চলতে চলতে বল্লাম, অনিতা, তুমি যখন লেখাপড়া শিখ্‌বে, বড় হবে—তখন একবার তোমার পিতৃভূমি দেখ্‌তে যেও। দেখবে সে দেশ কতো বড়। সেই দেশের সবাইকে তুমি আপনার করে নিতে পারবে না ?

ছোট্ট মেয়ে অনিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমায় তুলে দিলে একটা ট্রামে। তারপর বল্লে, এইবার আর তোমার পথ হারাবার ভয় নেই। ওকে কোলে তুলে আদর করে বিদায় দিলাম।

অনিতা ভিয়েনার পথ দিয়ে ছুটে চলেছে ওর মায়ের কাছে। মাঝপথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানালে। আমি যেন আর ওর দিকে ভালো করে চাইতে পারছি না! মনে জাগছে অন্য কথা। আজ যদি আমাদের ভাগ্যগুণে নেতাজী আমাদের মাঝখানে থাক্‌তেন—ভারতের এই দুঃখ, দৈন্য, এই গ্লানি, এই প্রাত্যহিক-আত্মহত্যা—তার কি লাঘব হত না ?

অনিতার দিকে আর একবার তাকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ; তোমাদের কাছে লুকোবো না, কিসের বেদনায় জানিনা—দু'চোখ আমার জলে ভরে এলো !

ভারতের মেয়ে কি কোনদিন ভারতে ফিরে আসবে না ?

ভিয়েনা দেখা আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের আসরের খেলাধূলা বিভাগের রবীন সরকার বর্তমানে লণ্ডনে আছে। পত্রযোগে তার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, সে ভিয়েনাতে আস্‌বে—তখন আমরা দুজন এক সঙ্গে লণ্ডন চলে যাবো।

যে কোনো কারণেই হোক রবীন এসে ভিয়েনায় পৌঁছুতে

পারেনি। তাই একা একা আর অতদূর লণ্ডনে যাওয়ার উৎসাহ বোধ করলাম না। ও যদি আসত তবে এই ফাঁকে আমার লণ্ডনটা দেখা হয়ে যেত। রবীন আস্‌বে এই আশাতেই দিন কয়েক থাক্‌লাম, তারপর স্থির করে ফেল্লাম—সুইজারল্যাণ্ড দেশটি দেখে বিমানযোগে দেশে ফিরে যাবো।

শ্রীমতী বসুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড দেখার বাসনা ব্যক্ত করেছিলাম। তাতে তিনি উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহর অতি সুন্দর যায়গা। সেখানে তাঁর এক বান্ধবী থাকেন তাঁর নাম হচ্ছে—মিসেস্ ইভা ওয়ালটার। "ইণ্ডিয়া ষ্টোর" নামে তাঁর একটি দোকান আছে। এই দোকানে ভারতবর্ষের বহু দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়। শ্রীমতী বসুর পরিচয় নিয়ে জুরিকেই যাবো স্থির করে ফেল্লাম। বিমানে না গিয়ে ট্রেনে যাওয়াই স্থির করলাম। তাতে সুইজারল্যাণ্ড দেশটি আরো কাছাকাছি দেখ্‌বার সুযোগ পাবো।

প্রথমে ডাঃ চৌধুরী প্রস্তাব করেছিলেন যে, বাসে করে যাওয়াই ভালো। তাতে সুইজারল্যাণ্ডের গ্রামগুলি আরো ভালো করে দেখ্‌বার সুবিধে হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, বাস রুট তখনো খোলেনি। এই বাস রুটটি খুল্‌বে গ্রীষ্মকালে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, অষ্ট্রিয়া কিম্বা সুইজারল্যাণ্ডের গ্রীষ্মকাল তখনো আসেনি!

ভিয়েনার কে, এল, এম অফিসে গিয়ে ঠিক করে এলাম যে, আমি রোম থেকে বিমানে দেশে ফিরবো এবং কবে আমার সিট্ চাই সেটাও জানিয়ে দিলাম ওদের অফিসে। ওরা আমষ্টারডামে ফোন করে জান্‌তে পারলেন যে, সিট এখন খালি নেই। তবে এর মধ্যে যদি কেউ যাওয়া বাতিল করে তবে সিট্ পাওয়া যাবে।

পাকাপাকি খবর জানবার জন্যে তাঁরা আমাকে বিকেল বেলা আবার অফিসে যেতে বল্লেন। বিকেলে গিয়ে খবর পেলাম যে, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী অনেক তদ্বির করে আমার নির্দ্ধারিত দিনেই সিট্ পেয়েছেন। আমি যেন সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে যথা সময়ে রোমে গিয়ে হাজির হই।

এদিকে তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সন্ধ্যের পর গাড়ী। আগে থেকে টিকিট কিনে রেখেছিলাম সিটি অফিসে। সন্ধ্যের মুখে একটা হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নিচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ সরকার। তিনি আমায় ট্রেনে তুলে দেবেন। খাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। তবু খাচ্ছি আর গল্প করছি। এমন সময় মিস্ পিক্সনার এসে হাজির। আমাদের গল্প চল্‌তে লাগ্‌লো। ডাঃ সরকারের ইচ্ছে এক বছর ভিয়েনায় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। সেই জন্যে তিনি একটি নিরিবিলি ঘর সস্তায় খুঁজ্‌ছিলেন। মিস্ পিক্সনারকে অনুরোধ করতে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন ভরসা দিলেন।

গল্প করতে করতে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে আমরা খেয়াল করিনি। হঠাৎ মিস্ পিক্সনার হাত ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, আপনার বড্ড দেরী হয়ে গেছে যে। যাই, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণে হোটেলে ফিরে গিয়ে সুটকেসগুলি নীচে নামিয়ে আনবার ব্যবস্থা করুন।

আমাদের কোনো কিছু বল্‌বার কিম্বা আপত্তি করার আগেই তিনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেলেন! ডাঃ সরকার আর আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এসে সুটকেশগুলি গুছিয়ে নিলাম। এর মধ্যে শ্রীমতী শেফালী নন্দী একটি সুটকেশ দিয়েছিলেন।

কল্‌কাতার তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে। ইতিমধ্যে মিস্ পিক্সনার ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। এমন একটি করিৎ-কর্ম্মা—মেয়ে কদাচ দেখা যায়। স্যুটকেশগুলি ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে কি ভাবে যে আমাদের একটু উপকার করবেন—সে বিষয়েও মিস্ পিক্সনারের প্রখর দৃষ্টি। বারণ করলে তিনি শুনবেন না। সত্যি কি ভাষায় তাকে ধন্যবাদ জানাবো এই কথাই বার বার ভাব্‌ছিলাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কর-মর্দ্দন করে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। ভিয়েনার এই হিতৈষী বান্ধবীর কথা কোনো দিনই ভুল্‌তে পারবো না।

ষ্টেষণে গিয়ে পৌঁছুলাম এবং ডাঃ সরকারের সহায়তায় স্যুটকেশগুলি নিয়ে নির্দ্দিষ্ট প্লাটফর্ম্মে হাজির হলাম।

ভিয়েনা থেকে ভারতবর্ষে যথা সময়ে চিঠি পৌঁছুচ্ছিল না। তাই ডাঃ সরকার তাঁর বাবার কাছে লেখা একটি জরুরী চিঠি আমার সঙ্গে দিয়ে দিলেন এবং হাওড়ার এক হাসপাতালে ফোন করে তাঁর সহকারীকে একটি প্রয়োজনীয় কথা যেন বলি এই অনুরোধ জানিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ট্রেনে উঠে একটি কামরায় ঢুকে আমার পুরানো পন্থা অবলম্বন করলাম; মানে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম—কেউ ইংরেজী জানেন কিনা?

একটি বৃদ্ধা মহিলা আর একটি তরুণী এক কোনে বসেছিলেন। তরুণীটি আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, ইংরেজীতে কথা বলা তার অভ্যেস আছে।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ত' এদেশের মেয়ে কোথায় ইংরেজী শিখ্‌লেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

তরুণী জবাব দিলেন, আমি এক সময় ভিয়েনাতে এক

আমেরিকান অফিসে কাজ করেছি—সেইখানেই ইংরেজী বল্‌তে শিখেছি।

বৃদ্ধা মহিলাটি জানালেন যে, তিনি এই তরুণীর মা। তরুণীটি সওদা ইত্যাদি করতে মায়ের কাছে শহরে এসেছিলেন। তার স্বামীর ঘর পল্লী অঞ্চলে। সেই খানেই তিনি ফিরে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধা মহিলাটি আমাকে ডেকে তাঁর কাছে বসালেন, বল্লেন, আমি ত' নেমে যাচ্ছি। আমার বাড়ী ভিয়েনা শহরেই। তোমরা দু জনে গল্প করতে করতে যাও—সে বেশ ভালোই হবে। মেয়ের একটি পথের সাথী জুট্‌ল বলে তিনি খুব খুশী হলেন।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করে বৃদ্ধা মহিলাটি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। তখন আমাদের দুইজনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সুরু হল। তরুণীটি সুন্দরী, আরো সুন্দর তার স্বাস্থ্য। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন তাঁর নিজের কথা। আমেরিকান অফিসে কাজ করবার সময় এই দেশেরই একজন তরুণের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তরুণটি বিমাণের ইঞ্জিনিয়ার। আলাপ ক্রমে প্রীতিতে পরিণত হয়—তারপর তারা পরস্পরকে বিয়ে করেন। সুখের সংসার তাদের, একটি নদীর ধারে চমৎকার বাংলো প্যার্ণের বাড়ী, বাড়ীর পেছনে উঁচু পাহাড়—সেখানে বরফ জমে থাকে। তরুণীটি বাড়ীতে গো-পালন করেন, শাক-সব্জীও প্রচুর হয় নিজের বাড়ীতে। পরিশ্রম করতে এতটুকু পেছপা নন। সম্প্রতি কিছুদিন হয় তাদের একটি মেয়ে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মেয়ে বল্‌তে একেবারে অজ্ঞান। সেই মেয়েরই নানা রকম পোষাক আর খেল্‌না কিন্‌তে তরুণীটি শহরে এসেছিলেন। ভিয়েনাতে এসে থাক্‌বার কোনো অসুবিধাই নেই। কেননা তার বাপ-মা ভিয়েনাতেই বসবাস করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাদের বাড়ী যখন নদীর ধারে—তখন নিশ্চয়ই খুব নদীতে সাঁতার কেটে স্নান করেন ?

তরুণী হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, না, ছোট নদী। পাহাড়ে নদীও বল্‌তে পারেন। সেই বরফ গলা জলে নাম্‌বে কার সাধ্যি ? তবে তার ভেতর ছিপ ফেলে মাছ ধরা চলে।

তরুণীটি দেখ্‌লাম, নিজের ছোট্ট সংসারের কথা বল্‌তে খুব ভালোবাসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি ত' মেয়েকে ফেলে চ'লে এসেছেন। আপনার স্বামী যাবেন কর্ম্মস্থলে, তখন আপনার মেয়েকে কে দেখ্‌বে ?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি অল্প বয়েসের একটি পরিচারিকা রেখেছি, সে দিন-রাত্তির আমার কাছে থাকে, আর আমার মেয়েকে খুব ভালোবাসে। তার ভরসাতেই ত' আমি বাইরে বেরুতে পারি। কি ভাবে তার স্বামী আর মেয়ে দরজার গোড়ায় তার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌বে—মেয়েটি কি ভাবে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই সব কথা বলে তরুণীটি একেবারে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছসিত হয়ে উঠ্‌ছিলেন।

তারপর তিনি হঠাৎ বলে বস্‌লেন, শুধু নিজের সংসারের কথাই ত' বল্‌ছি। এইবার আপনার বাড়ীর গল্প করুন—আমি শুন্‌বো। আমি উত্তর দিলাম, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আমি এসেছি। কোন্ উদ্দেশ্যে ভিয়েনাতে এসেছিলাম—সে কথাও তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

ভারতবর্ষের নাম শুনে তরুণী উত্তর দিলেন আমার স্বামীর খুব ইচ্ছে যে ভারতবর্ষ দেখেন। সুযোগ পেলেই বিমানে করে তিনি ভারতবর্ষ দেখ্‌তে যাবেন।

তারপর মেয়েটি আবার বল্লেন, না-না। খালি খালি নিজের কথাই বল্‌ছি। এইবার আপনি বলুন আপনার নিজের

বাড়ীর কথা, ছেলে-পুলের কথা তাদের মায়ের কথা, শুন্‌তে আমার ভারী ভালো লাগ্‌বে।

এই অষ্ট্রিয়ান দুহিতার সরল ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। বুঝ্‌লাম, নারী সব দেশেই সমান। স্নেহশীলা, নীড়-প্রিয়, আর সকল সংসারের খুঁটিনাটি কথা জান্‌বার জন্যে একান্ত উৎসুক। ভেবে দেখ্‌তে গেলে বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের কল্‌কাতার সহরে যে মহিলাটি সিনেমা কিম্বা থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়ে পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে রান্না আর গহনার আলোচনায় মত্ত হয়ে ওঠেন এবং অপরের সংসারের খুঁটিনাটি সব খবর জান্‌বার জন্যে উৎসুক হন তার সঙ্গে এই অষ্ট্রিয়ান তরুণীর মূলত কোনো তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু এই যে, এ'রা অতি ছেলেবেলা থেকেই স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করবার সুযোগ পান, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন, নিজের প্রয়োজন মত কাজ জুটিয়ে অর্থোপার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করেন আর মনোমত মানুষ পেলে বিয়ে করে নিজের ঘর বাঁধবার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

আজকের দিনে আমাদের শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েও ত ঠিক এই পথ ধরেই জীবনে এগিয়ে চলেছে। কাজেই সত্যিকারের তফাৎটা আর কোথায় ?

তরুণীটির অনুরোধে আমার বাড়ীর কথা, কে কে আছে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বল্‌তে হল। ছোট ছোট অকিঞ্চিৎকর প্রশ্নে তিনি আমাকে সব সময় সজাগ করে রাখলেন। বুঝলাম, বাইরের জগৎ সম্পর্কে জান্‌বার আগ্রহ এঁর কত বেশী। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা দু'জনে ঘরোয়া গল্প করলাম। আমরা উভয়েই রাত্রির খাওয়া শেষ করে এসেছিলাম, কিন্তু পরের দিনের Break fast এর খাবার সঙ্গে ছিল। কামরায় তাকিয়ে দেখি আশে-পাশে সবাই ঢুল্‌ছে—অনেকে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে !

হয়ত সারা রাতই আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয়ানক ঘুম পাচ্ছিল। তাই আমার সহযাত্রিণীকে শুভ-রাত্রি (Good night) জানিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেল্লাম। তিনিও শুভরাত্রি জানিয়ে কম্বলে নিজের দেহ ঢেকে নিলেন।

রাত্রি আরো গভীর হয়ে এলো।

আমাদের কাম্‌রায় যারা যারা ছিল সবাই চোখ বুঁজে নিদ্রা দেবীর ধ্যান করতে সুরু করে দিয়েছে। কারো কারো বা মৃদুমন্দ নাকের ডাকও শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ এক একটা ষ্টেশন যখন এসে যাচ্ছে—মাইকে জার্ম্মান ভাষায় যাত্রিদের জ্ঞাতব্য বিষয় শোনা যাচ্ছে। তখনই আচমকা ঘুমে-কাতর যাত্রীদের তন্দ্রা যাচ্ছে ভেঙে। তারা মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে ষ্টেষণের কর্তৃপক্ষকে। খামোখা এই ঘোষণা দিয়ে তাদের সুখ-নিদ্রাকে ভাঙবার কি দরকার ছিল বাপু! ষ্টেষণের লম্বা করিডোরে অনেক স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস্ গল্প বলছিল। এই শীতের রাত্তিরে তাদের চোখে ঘুম নেই!

শেষ রাত্তিরের দিকে কি একটা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তে একটি শ্রমিক মেয়ে আমার পাশে এসে বসল। কতই বা তার বয়েস হবে, ষোল কি সতেরো। সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রতিদিন যায় কোনো কারখানায় কাজ করতে। অত্যন্ত গরীব তারা—তাই উপার্জ্জনের পথ বেছে নিয়েছে। গরীব—কিন্তু তাই বলে দৈন্যের ছাপ তার পোষাকে কিম্বা চেহারায় কোথাও নেই। বাহুল্যবর্জ্জিত আঁটো-আঁটো পোষাক, নিটোল স্বাস্থ্য আর মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

শেষ রাত্তিরে যেতে হয় বলে ট্রেনে যতক্ষণ থাকে ঘুমিয়ে নেয়। ওকে ঘুমোনোর একটু সুবিধে করে দিলাম।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখ যেন একেবারে জুড়িয়ে গেল।

একদিকে পাহাড়—অন্যদিকে শ্যামল বন ভূমি—নানা ফুলে ছাওয়া। ট্রেন থেকে দেখে মনে হল—যেন টেক্‌নিকালার ছবি দেখছি।

টয়লেটে মুখ ধুয়ে সঙ্গে যে খাবার ছিল তাতে মনোনিবেশ করলাম। দেখলাম—আমার সহযাত্রিণীও তাঁর খাবারের পুঁটলি খুলে ফেলেছেন। গল্প করতে করতে খাওয়া চল্লো। সেই যে শ্রমিক মেয়েটি আমার পাশে এসে বসেছিল—তাকে খেতে অনুরোধ করলাম। মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক—কিছুতেই খাবে না। তখন তার হাতে একটি কেক গুঁজে দিতে নিলে।

এর পরের ষ্টেশন হচ্ছে অষ্ট্রিয়ার বর্ডার। আমার সহযাত্রিণী তরুণী ও শ্রমিক মেয়েটি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেমে গেল। সহযাত্রিণীটি নিজের হাতেই সব মাল বয়ে নিয়ে গেলেন—কোনো রকম কুলির ব্যবস্থা নেই এ সব ষ্টেষণে।

ট্রেনের জানালা থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম তরুণীটি কত ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছেন। এখান থেকে বাসে করে তাকে যেতে হবে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শিশু-কন্যা আর তার স্বামী। তাদের জন্যে কত কি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন—ওর ছোট নীড়ের আনন্দ ভাগ করে নেবার জন্যে যেন তরুণীটি অনাবিল উল্লাসে একরকম উড়ে চলেছেন! ইউরোপ পরিভ্রমণের সময় এইটেই বারেবারে লক্ষ্য করেছি যে, সবাই নীড়ের কাঙাল, যুদ্ধের অভিসম্পাতকে নতুন করে বরণ করতে কেউ রাজি নয়।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রথম ষ্টেষণে আবার সেই পাসপোর্ট পরীক্ষার হুল্লোড়, লোকজনের নামা-ওঠা—একটা বিরাট কর্ম্ম ব্যস্ততা। আমি ষ্টেষণে নেমে অষ্ট্রিয়ার মুদ্রা বদলে সুইজারল্যাণ্ডের মুদ্রা সংগ্রহ করে নিলাম। তারপর এসে বস্‌লাম নিজের কামরাটিতে।

যতই ট্রেন সুইজারল্যাণ্ডের ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলো প্রকৃতি রাণীর অভিনব প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের রামায়ণে আছে রাবণ রাজা যখন সীতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সীতাদেবী তার দেহের বহুমূল্য অলঙ্কার ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন যাতে সেই পথ অনুসরণ করে রামচন্দ্র সীতার সন্ধান পেতে পারেন।

সুইজারল্যাণ্ডের পথে পথে এই যে সবুজ, নীল, লাল, হল্‌দে, বেগুনীর সমারোহ—একি অলকাপুরীর পথ নির্দ্দেশ ? ওদিকে পর্ব্বত শ্রেণী তুষারের মুকুট পরে আকাশের মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা সুরু করে দিয়েছে—; পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে কলস্বরা ঝরণা, নীল জলের কি পরিপূর্ণ উচ্ছল নদী, কাক চক্ষু হ্রদ আর তার তীরে তীরে পটুয়ার তুলিতে আঁকা ছবির মতো সব বাড়ী…এদিকে শ্যামল উপত্যকায় রাশি রাশি নাম-না-জানা ফুল ফুটে রয়েছে !

আমাদের ভূস্বর্গ কাশ্মীর অবশ্য দেখিনি…কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে কেবলি মনে হচ্ছিল যেন কোনো প্রেক্ষাগৃহে বসে রঙীন চলচ্চিত্র দেখছি। কোনটা ছেড়ে কোন অংশটা আগে দেখবো ? ট্রেনের ডাইনে তাকালে বাম দিকে ভালো ভালো সুন্দর জিনিষগুলি হাত-ফস্কে চলে যায় ! প্রকৃতিরাণী যেন ওড়নার আড়ালে মুখ ঢেকে লুকোচুরি খেল্‌তে সুরু করে দিলেন। তার ওপর আবার মাঝে লম্বা টানেলের ভেতর ট্রেন ঢুকে যাচ্ছে। তখন কিন্তু সব অন্ধকার। যেন কোনো কৌতুকময়ী চোখ টিপে ধরেছেন। এক একবার মনে হচ্ছিল আরো কয়েক জোড়া চোখ যদি সাময়িক ভাবে ধার পাওয়া যেত ত খুব ভালো হত।

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস্ সুইজারল্যাণ্ডে এসেছিলাম তাইত'

তুচোখ দিয়ে প্রকৃতির পূর্ণ পেয়ালা পান করতে পারলাম! মনে জাগলো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লাইন—

"আহা কি দেখিলাম জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না!"

চেরীফুল ফোটা প্রান্তরের সে কি নয়ন-ভোলানো দৃশ্য! রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

ডান দিকেতে তাকাই যখন
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন
বামের দিকে চাইলে পরে
দখিন ডাকে আয়রে আয়!"

তুপাশের জীবন্ত ছবি দেখে-দেখে এত আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, কামরা যে আবার যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেছে সেদিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ কার কর্কশ কণ্ঠে ধ্যান ভেঙে গেল!

তাকিয়ে দেখি আমাদের কামরায় একটিও ঠাঁই নেই কিন্তু তারই মধ্যে একটি দেশোয়ালী লোক খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি আর তার নোংরা বোঁচ্কা-বুঁচ্কি নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে এবং একটি শক্ত ট্রাঙ্ক না স্যুটকেশ দিয়ে একটি মহিলার পায়ে আঘাত করেছে! মহিলার সঙ্গে একটি তরুণ যুবক ছিল; সে যতই আপত্তি করছে—দেশোয়ালী লোকটি তার কথা কিছুতেই শুন্তে রাজী নয়। সেই লোকের কর্কশ চীৎকারে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেছে! লোকটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় একেবারে অশিক্ষিত গেঁয়ো মানুষ সভ্যতা বা ভদ্রতার কোনো ধার ধারে না! সে কিছুতেই নড়বে না ওখান থেকে।

পরবর্ত্তী ষ্টেষণে তরুণ যুবকটি একটি টিকিট চেকারকে ডেকে নিয়ে এলো। তখন সেই ভদ্রলোক দেশোয়ালী লোকটিকে বাইরের

লম্বা বারান্দায় গিয়ে বস্‌তে বল্লেন। এতক্ষণে সমস্ত কলহের মীমাংসা হল!

একটি চমৎকার কবিতা পড়তে পড়তে হঠাৎ ছন্দ-পতন ঘট্‌লে যেমন রসজ্ঞ পাঠক হোঁচট্‌ খেয়ে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছিল। যাই হোক মহাযুদ্ধের পর পুনরায় শান্তি স্থাপিত হওয়ায় আবার নড়ে-চড়ে বস্‌লাম।

প্রকৃতি দেবী কিন্তু ঠিক তেমনি দু হাতে সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছেন সীতাদেবীর মতো।

এক সময় দেখা যায় যে, ট্রেণ অনেক ওপরে উঠে এসেছে—জানালা দিয়ে ঝুঁকে তাকালে চোখে পড়ে বহু নীচে পার্বত্য নদীতে ছেলেমেয়ের দল ছোট ছোট নৌকা করে মাছ ধরছে··· আনন্দে ঘুরে ফিরে নৌকা বাইছে···গান গাইছে সমবেত কণ্ঠে।

যেন একখানি কবিতার খাতা ছিঁড়ে ফেলে কোনো অদেখা রসিক ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময়। যে দিকে তাকাও একটি 'সনেট্‌' কিম্বা একটা গানের কলি চোখে ধরা পড়বে!

হঠাৎ একবার 'টয়লেটে' যাওয়ার প্রয়োজন হল।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি—সেই দেশোয়ালী লোকটি একটা বোতলের ভেতর থেকে পচা মাছ বের করে খাচ্ছে। দেখেই গাটা কেমন যেন ঘিন্‌ ঘিন করে উঠল।

'সুর' আর 'অসুর' এত কাছাকাছি বাস করে যে, ভাব্‌লে বিস্মিত হতে হয়!

অবশেষে এক সময় জুরিক ষ্টেষণে এসে পৌঁছুলাম।

মজা এই যে, যতক্ষণ ট্রেণে ছিলাম এতটুকু বৃষ্টি হয় নি। জুরিক ষ্টেষণে পৌঁছুবার একটু আগে থেকেই ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হল। বুঝ্‌লাম এইবার একটু ভেজাবে।

আমার সঙ্গে ছিল একটি ভারতীয় গরম টুপি। এতদিন সেটা কোন কাজেই আসেনি। এইবার সুটকেশ থেকে ওটাকে বের করে মস্তকোপরি রাজমুকুটের মতো বসিয়ে দিলাম। নিজেকে কেমন দেখ্‌তে হয়েছে একবার জানবার ভারী ইচ্ছে হল। কিন্তু টয়লেটে যাবার সময় ছিল না তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে তুটি ভারী সুটকেশ এবং আর একটি অ্যাটাচি কেস। ষ্টেষণে সুটকেশ তুটি জমা দিয়ে রসিদ নিলাম। অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে শ্রীমতী বসুর বান্ধবী মিসেস্ ইভা ওয়াল্‌টারের ঠিকানা ছিল।

শ্রীমতী বসু বলে দিয়েছিলেন যে, ষ্টেষণ থেকে বেরিয়ে একটি ছোট নদী পেরুতে হয় পুলের ওপর দিয়ে। সেখান থেকে তাঁর দোকান বেশী দূরে নয়। স্কাফেলগাছিতে এই দোকান—নাম 'ইণ্ডিয়া ষ্টোর'। ষ্টেষণ থেকে বেরিয়ে একটু বাঁয়ে হাঁটতেই নদীটি পেলাম। নদীর ওপারে চলে গেলাম। সেখানে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস্ করে জান্‌তে পারলাম যে—স্কাফেলগাছি বেশী দূরে নয়।

আরো খানিকটা পথ চল্‌বার পর মিল্‌লো আমার আকাঙ্খিত রাস্তা। তারই তিন নম্বরের বাড়ী আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। অতি সহজেই পাওয়া গেল 'ইণ্ডিয়া ষ্টোর'।

কলিং বেল টিপ্‌তেই একটি পরিচারিকা বেরিয়ে এলো। আমি মিসেস্ ইভা ওয়াল্‌টারের সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে সে আমায় দোতলায় পাঠিয়ে দিলে। মিসেস্ ওয়াল্‌টার তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। একটি বৃদ্ধা মহিলা দোকানে বসে কি সব কাজ-কর্ম্ম করছিলেন।

আমি কোত্থেকে আস্‌ছি, কি উদ্দেশ্যে আস্‌ছি সব তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে দোকানের ভেতরে নিয়ে বসালেন এবং

বল্লেন, এক্ষুণি ফোন করে মিসেস্ ওয়াল্টারকে আপনার আসার খবর জানাচ্ছি। খবরটা তাঁকে দিয়ে বৃদ্ধা মহিলা বল্লেন একটু বাদেই মিসেস্ ওয়াল্টার আসছেন। আপনি বসুন। আপনাকে এক কাপ কফি তৈরী করে দেবো কি ?

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিলাম, না-না, কফির কোনো দরকার নেই, আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

বৃদ্ধা মহিলাটি আমার টেবিলের ওপর অনেকগুলি ম্যাগাজিন এনে দিলেন—সময় কাটাবার জন্যে। তাকিয়ে দেখ্‌লাম, তার ভেতর ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিনও আছে। আপন মনে পত্রিকাগুলির পাতা ওল্‌টাতে লাগ্‌লাম।

দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখি ভারী সুন্দর করে সাজানো রয়েছে 'ইণ্ডিয়া ষ্টোর'। সাড়ী থেকে সুরু করে বহু দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় বস্তু এই দোকানে বিক্রী হয়। অজন্তা, ইলোরা, তাজমহল প্রভৃতির ছবি দিয়ে দেয়ালগুলি ভর্ত্তী। এক যায়গায় দেখ্‌লাম—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে মিসেস ইভা ওয়াল্টারের ছবি টাঙানো রয়েছে। বৃদ্ধা মহিলাটি বল্লেন, পণ্ডিত নেহেরু যখন এই অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিলেন তখন এই ফটোটি তোলা হয়েছিল।

বহু দূর দেশে ভারতের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর এই বিপনিটি দেখে সত্যি খুব ভালো লাগলো। কত রকম মূর্ত্তি যে এখানে সাজানো রয়েছে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটু বাদেই মিসেস্ ইভা ওয়ালটার এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন শ্রীমতী বসু কেমন আছেন।

আমি জবাব দিলাম, শ্রীমতী বসু তার সংসার আর অফিস নিয়ে এত ব্যস্ত যে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনার চিঠির তিনি

জবাব দিতে পারেন নি! সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আপনার বাসার কাছাকাছি আমার জন্যে একটি হোটেল ঠিক করে দিতে বলেছেন এবং আমি যাতে জুরিক শহর ভালো করে দেখতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মিসেস্ ওয়াল্‌টার হাসতে হাসতে বল্লেন, সব কিছু হবে। তিনি টেলিফোনটি তুলে নিলেন।

কিন্তু মজা এই যে, যে-হোটেলেই ফোন করেন খবর পাওয়া যায় সেটি একেবারে ভর্ত্তী, একটি কামরাও খালি নেই।

মিসেস্ ওয়াল্‌টার আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, ইউরোপের ভেতর একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডেই যুদ্ধের আঁচ লাগেনি। সেই জন্যে অন্যান্য দেশের চাইতে এখানকার আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। তা ছাড়া বহু বিদেশী এখানে বেড়াতে আসেন। তাই চট্ করে এখানকার হোটেলে যায়গা পাওয়া শক্ত।

মিসেস ওয়াল্‌টার কিন্তু হাল ছাড়লেন না। আবার নিজের হাতে ফোন তুলে নিলেন। অবশেষে একটি হোটেলের সন্ধান পাওয়া গেল। হোটেলটি মিসেস্ ওয়াল্‌টারের দোকানের খুব কাছেই। নাম হোটেল ক্রোনে (KRONE), তিনটি বোন হোটেলটি চালায়, খাওয়া-দাওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে, অথচ বেশ সস্তা।

মিসেস্ ওয়াল্‌টার নিজে এসে হোটেলটি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। ও বেলার খাওয়া-দাওয়ার পাট আমি ট্রেনে থাকতেই চুকিয়ে ফেলেছি। এখন আমার একটু ঘুমের প্রয়োজন। হোটেল পরি-চালিকা বোনেদের সঙ্গে আলাপ হল। একমাত্র বড় বোনই ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা চালাতে পারেন। একটি সুন্দর কামরা

আমায় ছেড়ে দিলেন। আমার দেহ-মনও ছিল খুব ক্লান্ত। বাইরে ঝির ঝির করে তখন জল পড়ছে। অকারণে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা মনে জাগ্‌ছিল।

জুতো খুলে গুন্ গুন্ করে গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে পাখীর পালকের লেপের তলায় তলিয়ে গেলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানতেও পারিনি। যখন ঘুম ভাঙ্গলো—প্রায় সন্ধ্যে হয়-হয়।

হাত মুখ ধুয়ে পোষাক বদ্‌লে মিসেস্ ওয়াল্‌টারের 'ইণ্ডিয়া ষ্টোরে' গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বল্লেন, এখনো ঝির-ঝির বৃষ্টি হচ্ছে—আজ আর জুরিক শহর কিছু দেখতে পারবেন না। তার চাইতে আমার বোনকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। খুব কাছেই একটা সিনেমা হাউসে আমেরিকান ছবি—'হোটেল সাহারা' দেখানো হচ্ছে। বেশ মজার ছবি, দেখে আনন্দ পাবেন।

প্রস্তাবটা মন্দ লাগলো না। এই ঝির-ঝির বৃষ্টির মধ্যে আর কোথায় ঘোরা যাবে? তা ছাড়া অনেক দিন ত সিনেমা দেখিনে! এখানকার হাউসও দেখা হবে।

মিসেস্ ওয়াল্‌টারের বোন আর আমি রওনা হলাম। সারা রাস্তা তিনি গল্প করতে করতে চল্লেন—আমাকে শুধু হাঁ-হাঁ দিয়ে যেতে হল। মেয়েরা গল্প করতে সত্যি পটু।

চট্ করে কোথায় ঢুকে একটি টিকিট কিনে এনে আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে বল্লেন, আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে। আপনার সঙ্গে ছবিটি উপভোগ করতে পারলাম না বলে খুব দুঃখিত। আপনি ছবিটি দেখুন কাল আবার দেখা হবে।

আমি তাকে টিকিটের দাম দিতে গেলাম তিনি কিছুতেই

নেবেন না! শেষকালে ছেলেমানুষের মতো একছুটে পালিয়ে গেলেন। দূর থেকে বল্লেন বাই—বাই—

অগত্যা ছবি-ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ছোট্ট সিনেমা হল। একেবারে যাকে বলে Little Theatre অথচ সিট্‌গুলি ভারী আরামপ্রদ। আড়াইশ তিনশর বেশী সিট নেই। টিকিটের দাম একটু বেশী। হোটেল সাহারা খুব উপভোগ্য ছবি। কলকাতায়ও দেখানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি হাস্যমুখর কাহিনী। ভারী খুসি হলাম ছবিখানি দেখে।

ছবি দেখবার পর বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিনেমা সংলগ্ন একটি সুন্দর রেস্তোরাঁ। সব রকম খাবারই পাওয়া যায়। সেইখানে রাত্তিরের আহার শেষ করে হোটেলের দিকে পা চালিয়ে দিলাম। তখনও জুরিকের আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওভারকোটের ওপর ছাতা চড়িয়ে দলে দলে নরনারী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই রাত্তিরে জুরিকের হোটেলে ঘুমটি খুব আরামদায়ক হয়েছিল।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্‌বার পর কাচের জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি বারি পতনের বিরাম নেই।

এই আবহাওয়ায় মিসেস্ ওয়াল্‌টারকে আর বিব্রত করতে ইচ্ছে হল না। তাই গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে আর মাথায় টুপি দিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম জুরিক শহর পরিক্রমায়।

প্রথমেই একটি ভালো ব্যাঙ্কের সন্ধান নিতে হবে। সঙ্গে যে টমাস কুকের ট্রাভেলার্স চেক্ আছে তা না ভাঙ্গালে চল্‌বে না। হাতের খুচ্‌রো টাকা-কড়ি ফুরিয়ে গেছে।

পথ চল্‌ছি আর লোককে জিজ্ঞেস করছি, ব্যাঙ্ক কোথায়? হঠাৎ দেবকন্যার মতো আবির্ভূতা হলেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিসেস আলি মহম্মদ।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি এখানে?

মিসেস্ আলি মহম্মদ উত্তর দিলেন, ভিয়েনা থেকে আমি জুরিকে চলে এসেছি সুইজারল্যাণ্ড দেখ্‌বার জন্যে।

মাথা নেড়ে বল্লাম, আমারও ত' ওই একই উদ্দেশ্য! "Great men and women think alike"

তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, এদিকে ব্যাঙ্ক কোথায় বল্‌তে পারেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ও! চেক্ ভাঙাবেন বুঝি? আমিও ত' এইমাত্র ভাঙিয়ে নিয়ে আস্‌ছি! চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।

তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। বিদেশে একেবারে পরমাত্মীয়ার মতো। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দুজনে পথ চল্‌তে লাগলাম।

সুদূর মাতৃভূমি থেকে দুজনে একই উদ্দেশ্যে বিদেশে এসেছি—আমাদের কথাবার্ত্তার এই আন্তরিকতাটা বেশ ফুটে উঠেছিল। গল্পে গল্পে খানিকটা পথ অতিক্রম করে তিনি আমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে হাজির করলেন। ওখানে কাজ শেষ হতে খুব দেরী হল না।

মিসেস্ আলি মহম্মদ বল্লেন, আমার একটু দরকার আছে, এইবার আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম তারপর যে যার পথে এগিয়ে গেলাম।

জুরিক শহরকে আমি দেখ্‌লাম যেন একটি ফুট্‌ফুটে কিশোরী কেবলই চোখের জল ফেলছে! ভিজে চোখে কৌতূহলের সঙ্গে

সে এই বিদেশীর দিকে তাকালো, কিন্তু তার সঙ্গে ভালো করে ভাব করতে পারলাম না।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভালো। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দেশ বলে এদেশের কোনো ক্ষতি ত' হয়ই নি, বরং যারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করেছে তাদের কাছে বহু জিনিষ বিক্রী করে সুইজারল্যাণ্ড বড়লোক হয়ে গেছে! বিভিন্ন দেশের বহু নামকরা ধনী আর ব্যবসায়ী সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে আসে—প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করবার জন্যে, অবসরে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে আর স্বাস্থ্যলাভের আশায়। সেই কারণেই সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলিতে টাকার ছিনি-মিনি চলে, স্থানীয় লোকেরা সময়ে অসময়ে বেশ দু পয়সা কামিয়ে নেয়—আর সেই জন্যেই সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলির হোটেলে চট্ করে কামরা খালি পাওয়া যায় না! সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলিতে যে খাদ্য পাওয়া যায় তা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো। জুরিকের যেখানে আমি উঠেছিলাম—সেই তিন বোনের হোটেলে আমি যে নদী ও হ্রদের মাছ খেয়েছিলাম তার স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে রয়েছে। আমাদের হোটেলের সাম্‌নে যে নদী তাতে বৃষ্টিতে ভিজে আমি মাছ ধরতে দেখেছি। নানারকম সুস্বাদু মাছ ওঠে সেই নদীতে। জুরিকের ছেলেমেয়েরা খুব হাসি-খুশী আর প্রমোদপ্রিয়। বৃষ্টি বলে তারা মুখ গোম্‌রা করে ঘরের কোনে বসে থাকেনি। দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায় হাস্য-মুখর আনন্দ-চঞ্চল।

জুরিকের ট্রাম-বাসও খুব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। আমি আগাগোড়া ট্রামেই ঘুরে বেরিয়েছি। এখানকার লোকেদের ব্যবহার

খুব ভালো। বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সর্ব্বদাই তৎপর! জুরিকের রাস্তা-ঘাট কোথাও সমতল, কোথাও বা ঢেউ-খেলানো। আশে-পাশের দৃশ্য অতি চমৎকার সে কথা ত' আগেই বলেছি। সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে আমি কেবলি ট্রামে করে ঘোরাঘুরি করেছি শহরের এক মাথা থেকে আর এক মাথা অবধি।

ষ্টেশনে যে সুটকেশগুলি জমা দিয়ে এসেছিলাম, হোটেলে পৌঁছেই পোর্টারকে দিয়ে সে গুলো আনিয়ে নিয়েছিলাম। সেজন্য তাকে আলাদা বক্‌শিস্ দিয়ে খুশী করতে হয়েছিল। সারাদিন ধরে শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি!

তবু যে আবহাওয়া আমাকে এতটুকু দমাতে পারেনি এবং ওভারকোট আর টুপী সম্বল করে আমি যে শুধু টহল দিতে পেরেছি সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু আমার মন পড়ে রয়েছে রোমে। আসার সময় রোমের আর্ট-গ্যালারী দেখে আস্‌তে পারিনি, যাওয়ার পথে ও জিনিসটা বাদ দিলে কিছুতেই চল্‌বে না। আর একটি জরুরী কাজ তখনো বাকি আছে। জুরিক শহরে যে ইটালীয়ান কনসোলেট্ আছে সেখানে গিয়ে ইটালী প্রবেশের 'ভিসা' আবার যোগাড় করতে হবে। তার মানে হচ্ছে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে যতবার ঢুক্‌তে হবে ততবার নতুন 'ভিসা' সংগ্রহ করে নিতে হবে। তার অর্থ—অর্থব্যয়। বৃষ্টি দেখে ভয় পেলে চল্‌বে না। ছুট্‌লাম আবার সেই ভিসা সংগ্রহ করতে। প্রথম বার গিয়ে শুন্‌লাম ভিসায় যিনি নাম স্বাক্ষর করবেন তিনি অফিসে নেই। কাজে কাজেই আবার যেতে হবে। চুপচাপ বসে থেকেও কোনো লাভ নেই। যতক্ষণ ছুটোছুটি ততক্ষণ দেখা। আবার খানিকটা ঘোরাঘুরি করে, হোটেল থেকে নিজের ফটো নিয়ে ইটালীয়ান

কনসোলেটে আবার হাজির হলাম। এখানে একটা ব্যাপারে ইটালীয়ান ভিসার একটু কড়াকড়ি দেখ্‌লাম। অষ্ট্রিয়া থেকে যখন সুইজারল্যাণ্ডের ভিসা সংগ্রহ করি তখন নতুন করে ফটোর প্রয়োজন হয় নি। পাসপোর্টে যে ফটো ছিল তাতেই কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড থেকে যখন ইটালীর 'ভিসা' জোগাড় করতে গেলাম—আবার নতুন করে ফটোর প্রয়োজন হল! এ কড়াকড়ির হেতু কি ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। যাই হোক, নতুন করে টাকাও দিতে হল—আবার ফটোও দাখিল করতে হল।

সারাদিন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ঠিক করলাম সেইদিন সন্ধ্যের ট্রেণেই রোম যাত্রা করবো। বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম ভিসা জোগাড় করে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাই হোটেলের পোর্টারকে বলে গিয়েছিলাম—সে যেন সুটকেশগুলি নিয়ে 'ইনফরমেশন অফিসের' সাম্‌নে আমার জন্যে অপেক্ষা করে—আমি এসে তাকে খুঁজে নেবো। ইটালীয়ান কনসোলেট্‌ থেকে ফিরে দেখি, পোর্টার ঠিক আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার সারা দেহ একেবারে বৃষ্টিতে ভিজে গেছে! ওর জন্যে মায়া হল। চার ফ্রাঙ্ক বক্‌শিস্‌ দিলাম।

তখনো ট্রেণের একটু দেরী ছিল। ষ্টেশনের একটি কুলির সঙ্গে আলাপ করতে লাগ্‌লাম! কি রকম তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী কথায় কথায় জেনে নিলাম। প্রশ্ন করলাম, দিনে কি রকম উপায় করো তুমি?

কুলিটি উত্তর দিলে, গড়ে পনর ফ্র্যাঙ্ক আমার উপার্জ্জন হয়। হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল—প্লাটফর্ম্মে গাড়ী দিয়েছে, সবাই ছুটেছে ভালো স্থান সংগ্রহের আশায়। বেশী ভারী মাল ছিল বলে

আমাকেও কুলি জোগাড় করে ছুট্তে হল। কুলিকে বলে দিলাম ভালো একটি কামরায় যেন আমাকে তুলে দেয়।

জুরিক থেকে রোমে যে ট্রেণটি চলাচল করে সত্যি সেটি আরাম দায়ক। এখানকার তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীতেও তা ছুর্লভ। সুতরাং অকারণ বেশী পয়সা খরচ না করে আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটই ক্রয় করেছিলাম। সহযাত্রী ও সহযাত্রিণীরা সবাই ভদ্র, সুতরাং অসুবিধের কোন কারণ ছিল না।

কুলি তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল। ভেলভেটের মতো নরম গদী-আঁটা একটি কামরায় সে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে তার পারিশ্রমিক চাইল। লোকটিকে খুশী করে বিদায় দিলাম।

এইবার আমার সহযাত্রী পেলাম এক কাব্য-রসিক ইটালীর ভদ্রলোককে। শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বেশ জ্ঞান আছে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও পণ্ডিত জহরলালের খবর রাখেন। ইটালী দেশের বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি সেইগুলি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন আর ইংরেজীতে ভাবার্থ করে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে খুব জমে উঠ্ল। বাঙ্লা কবিতার নমুনাও দিতে হল আমাকে। ভদ্রলোক জীবনে অনেক কিছু করেছেন। যাযাবরের জীবনও যাপন করেছেন বেশ কিছু দিন। সম্প্রতি পল্লী-অঞ্চলে একটি নিরিবিলি নীড় রচনা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন বলে স্থির করেছেন। ভদ্রলোকের বেশ বয়েস হয়েছে! কিন্তু মনের আনন্দ কিম্বা কাব্যের রস হৃদয় থেকে শুকিয়ে যায় নি! যখন আবৃত্তি করতে সুরু করেন, নিজের ভাবে নিজেই মস্গুল থাকেন।

সঙ্গে কিছু স্যাণ্ডুইচ আর ভালো কেক কিনে নিয়েছিলাম

জুরিক থেকে। এতেই রাত্রের আহার সমাধা করে ফেল্লাম। সকলেই সঙ্গের খাবার দিয়ে নৈশ-ভোজ সমাপন করল। খুব বড়লোক না হলে ট্রেণের রেষ্টুরেণ্ট কারে বড় কেউ একটা যায় না।

লোকজন উঠ্‌ছে নাম্‌ছে, নতুন মানুষ, নতুন মুখ, ক্ষণিকের পরিচয়, বেশ লাগ্‌ছিল। দুদিন বাদে কোথায় বা থাক্‌বো আমি আর কোথায় বা থাকবেন এঁরা! মাঝে মাঝে একটা আধ্যাত্মিক ভাব মনে জাগ্‌ছিল! আমি ত রোমের পথে ট্রেণে চেপে চলেছি, কল্‌কাতার মানুষরা এখন কে কি করছে? তাদের এখন দুপুর রাত: অনেকেই ফ্যান খুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছে কিন্তু আমি শীতে ওভার-কোটটা টেনে নিলাম!

ভাবতে কিন্তু বেশ মজা লাগে।

ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব চাইতে দ্রুতগামী হচ্ছে মানুষের মন! এক মুহূর্ত্তে লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করতে পারে। আমিও ত ঠিক তাই করছি! সুইজারল্যাণ্ড থেকে এক মুহূর্ত্তে কল্‌কাতায় পৌঁছে যাচ্ছি!

যখন জুরিক থেকে রওনা হয়েছিলাম, সেই কিশোরী ফুট্‌ফুটে মেয়েটির চোখ থেকে তখনো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। শ্যামল উপত্যকায়, ফুলের উদ্যানে, সুবিস্তীর্ণ হ্রদে, পাহাড়ের কিনারে কিনারে দেখে এলাম তার চোখের জলের ফোটা।

এখন ট্রেণ থেকে দেখ্‌ছি বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে। লোকজনের কোলাহল, নতুন পরিবেশ, নতুন মুখের আনাগোনা! কিন্তু এইটুকু লক্ষ্য করেছি যে জীবন এদের কানায়-কানায় পূর্ণ।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের যদি তুলনা করা যায় তবে একটি প্রশ্নই শুধু মনে জাগে যে,

আমাদের দেশ কবে এমনি স্বচ্ছলতায় ভরে উঠবে? সবাই মিলে সংগঠনের পথে হাত মেলালে কি আমরা 'ধন্য-ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়ে উঠতে পারবো না?

কবিগুরুর কবিতাই এই নিশীথ রাতে বারে বারে মনে জাগতে থাকে—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষ-পট। এ দৈন্য মাঝারে কবি—
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় ট্রেন সুইজারল্যাণ্ডের বর্ডারে এসে হাজির হল। এর পরেই সুরু হবে ইটালীর এলাকা। রেলের কর্ম্মচারীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করার ধূম পড়ে গেল। ট্রেণের বহুলোক এখানে নেবে গেল এবং বহু নতুন মানুষের আমদানি হল।

রাত্রি সাড়ে বারোটায় আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম বিখ্যাত ষ্টেশন মিলানে। অত রাত্তিরেও একদল মেয়ে-পুরুষ কাদের যেন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছে! তাদের চেঁচামেচি আর আনন্দ-ধ্বনিতে তন্দ্রা গেল ভেঙ্গে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। এখানেও অনেক নতুন মুখের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

নতুন যারা ট্রেণে উঠল, তারাও নিজ নিজ যায়গা করে নিয়ে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হল। কেউ কম্বল টেনে নিলে, কেউ বা নিজের

ওভারকোটের মধ্যেই কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে থাক্‌লো। ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিশি আবার তার মায়া-পরশ বুলিয়ে দিলে সারা কামরাটায়।

মনে খুব ভয় ছিল পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে থম্‌থমে মেঘলা আকাশ দেখবো কিনা! কিন্তু সূয্যিঠাকুরকে ধন্যবাদ—তার সোনালী কিরণ আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা করে নিলে। এখানে দৃশ্য পাল্‌টে গেছে—ইটালীর প্রকৃতিরাণী ঘোমটা খুলে আমাদের বল্লেন, "সুস্বাগতম্‌"! বৃষ্টিধোয়া মালিন্যহীন সুন্দর মুখখানি তাঁর। যেন স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্য্যে ঝলমল করছে!

রাত্তিরের কিছু কেক তখনো অবশিষ্ট ছিল। টয়লেটে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সেই কেকের সদ্ব্যবহার করা গেল।

অনেকে এখনও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তাদের যেন ওঠবার আদৌ ইচ্ছে নেই!

কাব্যরসিক ভদ্রলোকটি শেষ রাত্তিরে নেমে গেছেন। যারা সকালের রোদ্দুরে জেগে উঠেছেন তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব চলতে থাকলো। অনেকেই রোম পর্য্যন্ত যাবেন। কাজেই তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

সাধারণ গেরস্ত গোছের এক ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি ইণ্ডিয়াতে যে যাবো, সেটা জাহাজে না—বিমানে?

—বিমানে।

—তাহলে ত অনেক খরচ!

—তা খরচ আছে বৈকি! জবাবে আমি জানালাম।

আমি যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলাম এবং তাঁদের অর্থেই ফিরে যাচ্ছি, সেকথা আর ভদ্রলোককে বল্লাম না! কেননা তাহলে কিসের নিমন্ত্রণ, সেটা আবার ব্যাখ্যা করে বলতে হত।

আমরা রোম টার্মিনাসে গিয়ে হাজির হলাম সকাল এগারটায়। এখান থেকে এয়ার টার্মিনাস খুব বেশী দূর নয়।

সেখানে গিয়ে আগে স্যুটকেশগুলো গছিয়ে দিতে হবে। দুটো ভারী স্যুটকেশ ছিল বলে কুলির সাহায্য নিতে হল। সাধারণতঃ কুলির সাহায্য কেউ নেয় না। স্ত্রী-পুরুষ সবাই নিজের মাল নিজে বহন করে। ষ্টেশন ছেড়ে আসবার আগে সুইজারল্যাণ্ডের মুদ্রা ফ্রাঙ্ক বদ্‌লে লীরা নিয়ে নিলাম। মুদ্রার ব্যাপারে ইটালীই হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে গরীব দেশ। আসলে এদের কোন মুদ্রাই হাতে পড়ল না! শুধু কাগজের নোট! তা যেমন ছেঁড়া-খোঁড়া তেমনি নোংরা। হয়ত একটি নোটের অর্দ্ধেকটা নেই! তাও দিব্বি চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশে কিন্তু ছেঁড়া নোট কিছুতেই চলবে না।

যাই হোক, সেণ্ট্রাল বিমান-অফিসের কে, এল, এম ঘাঁটিতে আমার মাল-পত্তর জমা দিয়ে সেইখানকার টয়লেটে ভালো ভাবে দেহকে পরিষ্কার করে আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত করলাম। এইবার শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হল। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। লাঞ্চটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে হবে, নইলে আমার পূর্ব্ব-পরিকল্পনা অনুসারে আর্ট-গ্যালারী দেখা হবে না।

রোমের বিখ্যাত আর্ট-গ্যালারীর কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি। তা না দেখে কি দেশে ফিরতে পারি?

মনের বিলাস তখুনি মধুর হয়ে ওঠে যখন দেহের খোরাকে কিছুমাত্র কম্‌তি না থাকে। এয়ার টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনের কাছে একটি ভালো রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকলাম।

ক্ষুধাকে উপশম করবার জন্যেই অর্ডার দিলাম, চিকেন ফ্রাই। কিন্তু যে চিকেন ফ্রাই পাওয়া গেল, তা টাটকা ত নয়ই, আগের

দিনের বাসি। মনের ব্যথা মনে চেপে আনুষঙ্গিক আরো কিছু খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। অকারণ বেশ কিছু পয়সা গচ্চা গেল! যাওয়ার সময় রোমে সাংবাদিক বান্ধবী ডেলা ভিচিয়ার কৃপায় খাবারটা ভালো পাওয়া গিয়েছিল। সুযোগ-সুবিধে পেলেই রোমের দোকানদাররা বিদেশীদের ঠকিয়ে নেয় এই রকম একটা বদনাম ওদের দীর্ঘকাল ধরে আছে। রেস্তোরাঁর এই ব্যবহারে বুঝতে পারলাম যে, ওদের বদনামটা মিথ্যে নয়।

যাই হোক, রাস্তায় নেমে ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আর্ট-গ্যালারী দেখ্‌তে কোন্ ট্রামে উঠ্‌ব? প্রথম ত আর্ট-গ্যালারী জিনিষটা কি, তাই বোঝাতেই আমার খানিকটা সময় কেটে গেল। অনেক কসরৎ করে বিষয়টি যখন বোঝানো গেল, সে তখন একটি বিশেষ ট্রামে আমায় চাপিয়ে দিলে।

আশা রইল—ইংরেজী জানে এমন কাউকে ট্রামের ভেতর খুঁজে নেবো। আমাকে হতাশ হতে হয়নি। একটি তরুণ যুবককে পেলাম—যিনি কিছুকাল লণ্ডনে বাস করেছেন।

তিনি বল্লেন, এই ট্রাম ত সরাসরি আর্ট-গ্যালারীতে যাবে না, আপনাকে এক জায়গায় ট্রাম বদল করতে হবে। আচ্ছা আমি না হয় বলে দেবো'খন আপনাকে।

তরুণ যুবকের সহায়তায় গাড়ী বদল করে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম, তারপর ট্রামের কণ্ডাক্‌টার আমাকে আর্ট-গ্যালারীর সামনে নামিয়ে দিলে।

দেখ্‌লাম, আরও অনেকে টিকিট কেটে আর্ট-গ্যালারীর ভেতর ঢুক্‌ছে; আমিও মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রওনা হলাম।

ভেতরে ঢোক্‌বার সময় প্রশ্ন করলাম, ক'টা পর্য্যন্ত গ্যালারী খোলা থাকে?—জবাব পেলাম বিকেল ৪॥টা পর্য্যন্ত।

এই সময়ের মধ্যে সব কিছু দেখে নিতে হবে।

কিন্তু আর্ট-গ্যালারীর ভেতরে ঢুকে একেবারে যাকে বলে ডোম-কানা হয়ে গেলাম! কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আগে দেখি? যে দিকে তাকাই, শুধু ছবি আর পাথরের মূর্ত্তি!

তবে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার প্রশংসা করতেই হবে। প্রতি ঘরের নম্বর দেয়া আছে। সেই নম্বর অনুসরণ করে চল্‌লে দেখ্‌বার কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে।

পৃথিবীতে যত-রকম ছবি আঁকবার পদ্ধতি (Technique) আছে, এই আর্ট-গ্যালারীতে তার নমুনা অতি বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অতি প্রাচীন ধরণের ইটালীর তৈলচিত্র থেকে সুরু করে অতি-আধুনিক পিকাসো পদ্ধতির চিত্রও এই অপরূপ শিল্প-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে।

ওয়াটার-কালার, অয়েল-কালার, প্যাষ্টেল, ক্রেয়ন, সস্‌, পেন্সিল সব কিছুতেই আঁকা ছবি বাছাই করে এই বিশ্ববিখ্যাত ইটালীর আর্ট-গ্যালারীতে সুন্দর ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমাদের যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথের টেক্‌নিকে আঁকা ছবিও প্রচুর দেখতে পেলাম।

ছোটদের আঁকা ছবি—যা আমরা হয়ত হেলা ভরে ফেলে দি, তাও স্থান পেয়েছে এই আর্ট-গ্যালারীতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম করা শিল্পীর ছবিও এই শিল্প-সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো শিল্পীর ছবি চোখে পড়ল না!

এ বিষয়ে আমাদের দেশের শিল্পীবৃন্দের পক্ষ থেকে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।

ইটালীর ভাস্কর্য্য জগতের সেরা। এই আর্ট-গ্যালারীতে

যে সব ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে তা বিস্ময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। এক একটি মূর্ত্তি এমন সজীব যে, মনে হয় গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌লে এক্ষুণি ঘুম থেকে জেগে উঠে কথা বল্‌তে সুরু করবে! এ যেন কোন মায়াদানবের মায়াপুরী! সব কাল-ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। কোনো রাজপুত্তুর এসে যদি সোনার কাঠির ছোঁয়া দেয় তবে এক মুহূর্ত্তে সবাই প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠ্‌বে। জেগে উঠ্‌বে এই গ্ল্যাডিয়েটর, ওই হারকিউলিস, তার সাঙ্গ-পাঙ্গের দল, ওই শিকারী আর তার কুকুর, কষ্টি-পাথরে তৈরী ওই সুন্দরী ঘুম থেকে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বস্‌বে! ছেলের দল জেগে উঠে হল্লা-হাসিতে এই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ মুখরিত করে তুল্‌বে! কত যুগ আগে ইটালীয়ান শিল্পীর তুলিতে আঁকা ওই যুদ্ধ-বিগ্রহ সজীব হয়ে উঠবে! বন্দুকের আওয়াজ আর কামানের শব্দে এখানে কান পাতা দায় হয়ে উঠবে! ওই যে পরীরা ঝরণা-জলে স্নান করছে, ওরা কি গুণ-গুণ করে গান গাইতে সুরু করে দেবে না?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম! এ-কক্ষ থেকে ও-কক্ষ, এ-রাজ্যি থেকে ও-রাজ্যি পরিক্রমার যেন শেষ নেই! এ কোন্ মায়াপুরীতে এসে উপস্থিত হলাম?

ঘুরতে ঘুরতে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে যাতে বিশ্রামের জন্যে বস্‌তে পারে, সেজন্য কক্ষগুলির মধ্যে কৌচ ইত্যাদি পাতা আছে। তার চারদিকে ফুলের টব দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে সাজানো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ বিভিন্ন কক্ষ-পরিক্রমায় ক্লান্ত হয়ে ওখানে বসে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করছে। আমাকেও দুই-একবার এই ভাবে বসে পা দুটিকে ক্ষণিক অবসর দিতে হল। একবার এমন জলতেষ্টা পেলো যে, খুঁজে খুঁজে একটি নির্জ্জন প্রাঙ্গণে গিয়ে একটি জলের

কল আবিষ্কার করলাম। সেখানেও কত রকম মূর্ত্তি সাজানো রয়েছে! যাই হোক, ঠাণ্ডা জলে তৃষ্ণা দূর করা গেল।

আবার সুরু হল বিভিন্ন কক্ষ-পরিক্রমা। একটি বিরাট মূর্ত্তির সংস্কার করা হচ্ছে। মূর্ত্তিটি দোতলা সমান উঁচু, তার চার দিকে বাঁশের ভাড়া বেঁধে কাজ চল্‌ছে। সেখানেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মেরামতের কাজ দেখ্‌লাম।

এই বিচিত্র শিল্প-সম্ভার প্রদক্ষিণ করতে করতে মনে হল ছবিই হচ্ছে একমাত্র ভাষা যা পৃথিবীর সব দেশের লোক পড়তে পারে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর লোক অবধি!

এই যে আমি ভারতবর্ষের লোক এসেছি সুদূর রোমে, এদেশের ভাষা আমি বুঝতে পারি না। ওরাও জানে না আমাদের দেশের ভাষা। কিন্তু এই উভয় দেশের লোকের সাম্‌নে একটি সুন্দর তৈলচিত্র রাখা হোক দেখি। তার মর্ম্মার্থ উভয় দেশের লোকই দেখামাত্রই অনুধাবন করতে পারবে। কাজেই ছবি হচ্ছে এমন এক ভাষা, যা সব দেশের লোক অনায়াসে পড়তে পারে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিরা এমন একটি ঔষধের আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যা নাকি অনুপান-ভেদে সব রকম রোগে কাজ দেবে। মানে, বিভিন্ন জিনিষের সঙ্গে খেলে বিভিন্ন রোগ সারবে। সেই গবেষণার ফল হচ্ছে মকরধ্বজ। আদা ও তুলসী পাতার রস দিয়ে খেলে সর্দ্দি-কাশি সারে, আবার চালের জল দিয়ে খেলে বায়ুর দমন হয়। এমনি ভাবে বিভিন্ন উপায়ে মকরধ্বজ খেলে বিভিন্ন রকম রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। ঔষধ একটি, কিন্তু প্রয়োগ-বিধি পৃথক। ছবিও হচ্ছে ঠিক সেই একটি ভাষা, যা সারা বিশ্বের লোক পড়তে পারে।

আমি নিজে এক সময় ছবি আঁকতাম, সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়

থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি। শিল্প-রসিক বলে মনে মনে একটা গর্ব্ব আছে। তবু ইটালীর আর্ট-গ্যালারীতে শিল্প-সম্ভার দেখে মনে হল দিনের পর দিন এখানে তীর্থযাত্রীর মতো এলে তবে যদি কিছুটা রস গ্রহণ করা যায়!

৪॥টায় আর্ট গ্যালারী বন্ধ হয়ে যেতে সেখান থেকে চলে আস্‌তে হল। ঔদরিকের সাম্‌নে নানা রকম মুখরোচক খাবার সাজিয়ে দিয়ে তার খাওয়ায় আগেই যদি থালা সরিয়ে নেওয়া হয় তবে সেই পেটুকের মুখের অবস্থা যেমন দাঁড়ায়, আমারও ঠিক সেই রকম ভাব হয়েছিল।

যাই হোক, অনুশোচনা করে লাভ নেই। ধীরে ধীরে সদর রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে একটি নির্জ্জন পার্কে গিয়ে হাজির হলাম! চারিদিকে সুন্দর গাছপালা লতাগুল্ম, মাঝখানে তক্‌তকে পরিষ্কার পার্কটি যেন ছবি আঁকা!

সেইখানে রোমের ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে।

তখনো ছবি দেখার রেশ মনে জাগ্‌ছিল। তাই চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ ধরে ফুলের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখ্‌লাম।

বিদেশী দেখে কৌতূহলী হয়ে ওরা কাছে এগিয়ে এলো।

আস্তে আস্তে ভাব জমে উঠ্‌ল কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে।

রোমে এসেছি, ইচ্ছে ছিল ডেলা ভিচিয়া ও ফ্লোরিয়ানা মার্টিনেটোর সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে। দেখা হলেই ওদের ঋণের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠবে। ওরা নানাভাবে আমার জন্যে খরচ করতে থাক্‌বে হয়ত কোনো ওজর-

আপত্তি শুন্‌বে না। তাই ঠিক করলাম, দেশে ফিরে গিয়েই দুজনের কাছে চিঠি লিখ্‌বো।

পার্ক থেকে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম।

পায়ের একটা কড়া ক'দিন থেকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আজ আর্ট-গ্যালারীতে অনেকক্ষণ হেঁটে কড়ার ব্যথাটা নতুন করে সুরু হল। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এখন কোনো ট্রামে উঠে পড়া।

ষ্টেশনে যাচ্ছে এমন একটি ট্রামে উঠে পড়লাম।

ট্রাম থেকে নেমে কিছু মিষ্টি আর ফল কিনে নিলাম। ক্ষিদেও খুব বেশী নেই। একটু সাত্তিক আহার করা যাক্। মিষ্টি মানে অবশ্য ভীম নাগের সন্দেশ কিম্বা বাগবাজারের রসগোল্লা নয়, নানা রকমের কেক। এ দেশের ফল খুব ভালো। কলা, কমলা, আপেল ইত্যাদি।

একবার ভাব্‌লাম, ঢুকে পড়ি রোমের একটা সিনেমা-হাউসে। ইটালীর ছবি দেখে যাই একটা। ইটালীর ছবি অবশ্য কলকাতাতেই দেখা আছে। তা ছাড়া পায়ের কড়াটা খুব কষ্ট দিচ্ছিল। তাই সোজা কে. এল. এম. অফিসে গিয়ে হাজির হলাম।

তাড়াহুড়ায় দুদিন দাড়ি কামানো হয় নি। কে. এল. এম. টয়লেটে সব ব্যবস্থাই আছে। বেশ করে দাড়ি কামিয়ে নেওয়া গেল। তারপর যথারীতি সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করে আগে থেকে কিনে আনা ফল আর কেকগুলির সদ্ব্যবহার করলাম।

এয়ার টার্মিনাসের মধ্যেই একটি চমৎকার বুকষ্টল আছে। পৃথিবীর যত রাজ্যের ম্যাগাজিন সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। একটি মেয়ে তার ভারপ্রাপ্তা কর্ম্মী। তার সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে সন্ধ্যেবেলা বসে ম্যাগাজিনগুলি উল্‌টে-পাল্‌টে পড়ে, ছবি দেখে মধুর আমেজে সময় কাটিয়ে দিলাম।

হঠাৎ দেখি, শাড়ী-পরা একটি মেয়ে এসে সেখানে ঢুক্‌লেন। পরিচয় নিয়ে জান্‌লাম, তিনি বম্বে থেকে আস্‌ছেন। যাচ্ছেন লণ্ডনে বেড়াতে। সঙ্গে তাঁর স্বামী আছেন। তিনি বোম্বাই অঞ্চলের একজন নামকরা ব্যবসায়ী। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে দেশের খবর নিয়ে আলোচনা হল।

কিন্তু শরীর আমার সত্যি ক্লান্ত।

খবর নিয়ে জান্‌লাম যে, শেষ রাত্তিরে প্লেন ছাড়বে।

কে. এল. এম. অফিসের এক কোণে ঘুমুবার জন্যেও আরাম-দায়ক সোফা আছে। সেইখানে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

সারা দিনের ছুটোছুটি আর পরিশ্রমে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জান্‌তেও পারিনি!

হঠাৎ কাদের কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি, ১১৷৷টা বেজেছে। যাত্রীরা আস্‌তে সুরু করেছে। একদল যাবে—লণ্ডনের দিকে, আর একদল যাবে পূর্ব্ব-অঞ্চলে (FAR EAST)। এদের ছেলে-পুলেদের হুল্লোড়, মাল-পত্রের ওজন, টিকিট করা…এই সব নিয়েই যত কোলাহল। আমার কিন্তু এ সবের কোনো ঝামেলা ছিল না। কেননা আমি ভিয়েনা থাক্‌তেই খবর পাঠিয়ে সিট্ রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। এখন সময় মত উঠ্‌লেই হল।

গল্প-গুজবে আর নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। রাত পৌণে একটায় আমরা কে. এল. এম. বাস্ যোগে রোমের বিমান-ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের বাস্ যখন দ্রুতবেগে রোম শহরের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তাকিয়ে দেখি তখনো ট্রাম চল্‌ছে। অথচ ভিয়েনাতে কত আগে ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্ককের এক ব্যবসায়ী ছিলেন আমার

পাশে। তিনি বল্লেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। নিউইয়র্কে সারারাত ধরে ট্রাম চলে।

রোম বিমান-ঘাঁটিতে 'কাষ্টম-বৈতরণী' পার হতে হল। সুটকেশ খুলে দেখাতে হল ভেতরে কি কি পদার্থ আছে।

এরপর কে. এল. এম. কর্ম্মীরা যাত্রীদের পরিবেশন করল লেমনেড্ ও নোন্তা-মিষ্টি নানারকম খাবার। অত রাত্তির কিন্তু খেতে খারাপ লাগলো না।

বিমানে উঠে যার যার যায়গা সংগ্রহ করে নেয়া গেল। প্রত্যেকের আসনের সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এলো Chewing Gum. বিমান ওড়বার পর কিছুদূর উঠতেই এলো লেমনেড। শেষ রাত্তিরে সবাই একটু ঘুমুতে চায়। তাই কম্বল টেনে নিয়ে যে যার মতো দেহ এলিয়ে দিলে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙতে নীচে চোখে পড়ল মিশরের তীরভূমি। ঝল্‌মল্ করছে সকালের সোনালী রোদ। আমাদের বিমান ভূমধ্য সাগরের ওপর দিয়ে উড়তে লাগলো। সে যে কী সুন্দর দৃশ্য কথার পর কথা গেঁথে বর্ণনা দেয়া চলে না, শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবার। বিমান-বালিকা সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করে দিয়ে গেল গরম ও উপভোগ্য কোকো। ভারী আরাম লাগছিল তখন। ভূমধ্য সাগর দেখা আর একটু একটু করে কোকোর কাপে চুমুক দেয়া।

আটটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে আমরা কায়রোতে এসে অবতরণ করলাম। যাবার বেলা কিন্তু কায়রোতে বিমান নামে নি। যাই হোক ফিরতি মুখে একটা নতুন যায়গা দেখা গেল। কায়রোর গল্প এত পড়েছি আর কায়রোর ছবি এত সিনেমায় দেখেছি···এ সেই বিখ্যাত কায়রো! কায়রোর সকালটা কিন্তু বেশ আলো—ঝল্‌মলে।

এখানে ওদের মুশলমানী দেশী পোষাক আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ দুই রকমই চোখে পড়ল।

কায়রোর বিমান-ঘাঁটিতে দোতলার ওপর যাত্রীদের সুবিধের জন্যে একটি নতুন রেষ্টুরেন্ট তৈরী করা হয়েছে। বিমানের কর্ম্মীরা আমাদের সেইখানে নিয়ে হাজির করল।

দেখি প্রাতরাশের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কমলালেবুর রস, Bread-Butter, অমলেট, আলু সেদ্ধ, যার যেমন প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি রয়েছে চা। ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার দিকে এসে এই প্রথম চা পান করে ভারী আরাম বোধ হল।

এই রেষ্টুরেন্টটির চারদিকে লম্বা লম্বা জানালা। চতুর্দ্দিকে ঘুরলে কায়রোর দৃশ্য সুন্দর ভাবে চোখে পড়ে।

স্থানীয় একটি উভচর বিমানকে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছিল। বিমানটি দেখতে খুব ছোট। কায়রোর জাতীয় পতাকা চাঁদ আর তিনটি তারকা নিয়ে সকাল বেলার সমীরণে পত পত্ করে উড়ছে। দূরে একটি ট্রেণ যাচ্ছে, তার পাঁচটি কামরা। চারদিকের জানালা ধরে ধরে আমরা দেশটিকে দেখে নিচ্ছিলাম। এই হচ্ছে সেই পিরামিড ফিনিক্স-এর দেশ। কত রূপকথা আর কাহিনী এই দেশকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। মিশরের সংস্কৃতি আর সভ্যতা পৃথিবীর কত পুরোণো! এখানে দুটি ছোট্ট স্থানীয় ছেলের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হল। তাদের ইচ্ছে, জানালা বেয়ে উঠে চারদিকের সব কিছু দেখে নেয়। কিন্তু তাতে পড়ে যাবার যথেষ্ট ভয় আছে। কাজেই আমরা দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে এসে ওদের জানালার ধারে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তখন ওরা ভারী খুশী হয়ে উঠল।

কায়রোতে আমাদের পাসপোর্ট দেখা হল।

বিমানের যন্ত্রগুলি আগাগোড়া পরীক্ষা করে আবার ঠিক বারোটার সময় আমাদের যাত্রা সুরু হল।

ইউরোপে যাওয়ার সময় রাত্তিরের অন্ধকারে সুয়েজ-খাল কিচ্ছু দেখ্‌তে পাইনি। এইবার এমন সুন্দর ভাবে ক্যানেলটি আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরা পড়ল যে কী বলব! আগেই বিমানে থেকে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছিল যে, বিমানের বাঁদিকে সুয়েজ ক্যানেল দেখা যাবে। আমরা সবাই ওঁৎ পেতেই ছিলাম। আমার সিট্‌ ছিল বিমানের ডান দিকে, যেই সুয়েজ-খাল এলো অম্‌নি একলাফে উঠে গিয়ে বাঁ দিকের একটি আসন দখল করে নিলাম। এখান থেকে সূর্য্যের আলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল—গোটা খালটি। কোন্‌ দিক থেকে এসে সমুদ্রে মিশেছে, চমৎকার ধরা পড়েছিল ওপর থেকে। দু দিকে শুধু বালি—মাঝখানে মোটা রজত-রেখার মতো সেই বিখ্যাত সুয়েজ-খাল। খালের ভেতর যে জাহাজ চলাচল করছিল—সেগুলি দেখাচ্ছিল দেশালাইয়ের বাক্সের মতো। যেন ছেলেরা তৈরী করে খেলাঘরের খালে ভাসিয়ে দিয়েছে।

বিমানের মধ্যে যে সুন্দর টয়লেট্‌ আছে তাতে ঢুকে—বেশ করে মাথাটা ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেল্লাম। এখন আর গরম জলের প্রয়োজন নেই, দেশের কাছাকাছি এসেছি।

মাথা ধোয়ার পর মন আরো খুশী হয়ে গেল।

বিমানের ওপরই লাঞ্চের রাজসিক আয়োজন।

লাঞ্চের পর ইউরোপীয় যাত্রীরা যখন প্রচুর মদ গিল্‌ছিল আমি কমলা লেবুর রস নিয়ে আরাম করে একটু একটু করে চেখে-চেখে মুখে নিচ্ছিলাম।

এবার ফেরবার মুখে আমার পাশে সিট্‌ পড়েছিল এক

ইটালীর ভদ্রলোকের। বাড়ী তাঁর মিলানে। বড় ব্যবসায়ী, পূর্ব্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলে কন্‌ট্রাক্‌টারী ব্যবসা আছে। দেশ থেকে কর্ম্মস্থলে, মানে ব্যবসার জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক অমায়িক আর আলাপী। আমার কলমটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কলমটা দিয়েই লেখাপড়ার কাজ চালালাম।

ভদ্রলোক গল্প করছিলেন—তাঁর স্ত্রী ছেলে-পুলে নিয়ে থাকেন এক যায়গায়, তাঁর মা-বোন থাকেন অন্য এক শহরে। বোনটির এখনো বিয়ে হয় নি, কোন এক মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে গিয়ে মা-বোন আর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসেন।

ট্রোয়িয়ানি রেনাটো হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। আমরা এক সঙ্গে বসেই লাঞ্চ খাচ্ছিলাম আর সেই সঙ্গে গল্প-গুজব চল্‌ছিল। খাওয়াটাও দিব্বি জমে উঠেছিল।

হঠাৎ কি ভীমরতি হল বিমান-বালিকাকে জিজ্ঞেস্ করে বস্‌লাম, কিসের মাংস খাচ্ছি ?

খুব খুশী হয়ে জবাব দিলে, calf, খুব টাট্‌কা। ট্রোয়িয়ানি রেনাটোও আমাকে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ, চমৎকার মাংস খেয়ে যান না—

শাস্ত্র বাক্য—ঘ্রানেন অর্দ্ধ ভোজনম্।

কিন্তু তখন আমার অর্দ্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে! মনে মনে ভাব্‌ছি, কেন মরতে নাম জিজ্ঞেস্ করতে গেলাম ? তা হলে ত' আর এ বিপদে পড়তে হত না! যাই হোক, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গল্প জানা ছিল। একসঙ্গে অনেকে খেতে বসেছেন, হঠাৎ দেখেন ডালের মধ্যে আরশুলা সেদ্ধ হয়ে গেছে! পাছে জানাজানি হলে অন্য

কারো ঘেন্না হয় তাই অবলীলা ক্রমে আরশুলা চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লেন।

আমারও তখন সেই অবস্থা! যদি ঘেন্না বা বিরক্তি প্রকাশ করি তবে পাশের লোক কি ভাব্‌বে! তাই যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন মনে করে দিব্বি হাসি মুখে খাওয়া শেষ করে ফেল্লাম। গল্পটা শুনে অনেকের হয়ত গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করবে কিন্তু আমি অম্লান বদনে সেদিনকার লাঞ্চ শেষ করেছিলাম। শেষের দিকে কমলালেবুর রস খেয়ে অবশ্য শোধন করে নিয়েছিলাম।

হঠাৎ বিমান থেকে ঘোষণা শোনা গেল, বাগদাদে আমরা নাকি বৃষ্টি পাবো।

জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখি আকাশ দিব্যি পরিষ্কার বৃষ্টির কোনো লক্ষণই নেই। কি জানি বিমানের ব্যাপার! অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে ত'—তখন বোধ করি আমরা মেঘের রাজ্যে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে উঠ্‌ব!

আচ্ছা, দেখা যাক্ কি হয়!

বাগদাদে বিমান গিয়ে পৌঁছুলো দুপুর ২॥টার একটু পরে। বৃষ্টির নামগন্ধও নেই! আমরা নেমে গিয়ে যথারীতি পাসপোর্ট দেখিয়ে নানারকম ফল আর কমলালেবুর রস খেয়ে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে ফেল্লাম।

বাগদাদ বিমান ঘাঁটিতে বেড়াতে বেড়াতে ইন্দোনেশিয়া লিগেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী মিঃ এম্‌জিটার সঙ্গে আলাপ হল। অল্প বয়েসী ভদ্রলোক। অমায়িক প্রকৃতির লোক। নিজে থেকেই এসেই আলাপ করলেন। প্রতিবেশী দেশ হিসাবে আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত এই কথাই জানালেন বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে। শুধু তাই নয়। ভদ্রলোক অনুরোধ করলেন,

আমার ফ্যামিলি-গ্রুপ ফটো তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিনিও পাঠিয়ে দেবেন বলে আমায় জানালেন। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল বেড়াতে বেড়াতে। ইন্দোনেশিয়ার রূপকথা সম্পর্কেও বেশ কিছুটা আলোচনা হল আমাদের।

বাগদাদ থেকে বিমান ছাড়ল বিকেল সোয়া চারটায়। এখান থেকে তুজন বোরখাপরা মুশলমান মহিলা উঠ্‌লেন। তাঁরা বয়স্কা এবং সব সময়ই মালা জপ করছিলেন। জানা গেল তাঁরা যাচ্ছেন করাচি।

বিমান এখান থেকে সোজা করাচি যাবে না। মাঝপথে ডারহানেও থাম্‌বে।

বিমানের চল্‌তি পথে যখন ঝড়-ঝাপ্‌টা কিম্বা আচম্‌কা বায়ুর স্রোত আসে তখন 'বাম্প' করে ধাক্কায়-ধাক্কায় ওপরে উঠে যায়। এই রকম ভাবে হঠাৎ বায়ুর স্রোতের মধ্যে পড়ে আমাদের বিমান ক্রমাগত বাম্প করে ওপরে উঠে যেতে লাগ্‌লো। এই ধাক্কা অনেকেই সহ্য করতে পারে না। তাদের বমির উদ্রেক হয়। অবশ্য বিমানে প্রত্যেক যাত্রীর সাম্‌নেই এক রকম কাগজের ঠোঙা তৈরী থাকে। প্রয়োজন হলে তার মধ্যেই বমি করতে হবে। এই অবস্থাকে বলে Air Sickness. বিমান-বালিকারা তখন খুব তৎপর হয়ে ওঠে আর এক রক রকম 'লোসন' প্রত্যেকের রুমালে ঢেলে দেয়। তাই ঘন ঘন শুঁকে বমির হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা চলে। ডারহানের পথে ঠিক এই রকম অবস্থা একবার হয়েছিল। অনেকেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাকিয়ে দেখি, বোরখা ঢাকা সেই তুটি মুশলমান মহিলা ভয় পেয়ে ক্রমাগত 'আল্লা আল্লা' করেছেন আর মালা জপ করে চলেছেন!

যাই হোক এই ভাবটা খানিকক্ষণ বাদেই কেটে গেল। সন্ধ্যের

মুখে আমরা ডারহানে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানকার সাঁঝের বেলার হাওয়াটি খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল।

ডারহানের বিমান ঘাঁটিতে গ্রহ-নক্ষত্র, রাশি-চক্রের যে সুন্দর ছবিটি আঁকা আছে তা সহজেই যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের জ্যোতিষীরা মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক, সিংহ রাশি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ভাগ্য-ফল গননা করেন। সেই সব রাশিকে নিয়ে এমন সুন্দর ও বিরাট ছবি এঁকে রাখা হয়েছে যা সত্যি কৌতূহলোদ্দীপক।

ডারহান থেকে বিমান ছেড়ে করাচীতে পৌঁছুলো দুপুর রাত্তিরে। কিন্তু তার আগেই বিমানের ওপর চমৎকার ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল যা আমি খেয়ে শেষ করতে পারিনি! স্যুপ দিয়ে সুরু করে পুডিং দিয়ে শেষ হয়েছিল সেই ভোজ। সকলের শেষে ছিল কফি। যাদের ইচ্ছে কোল্ড্ ড্রিঙ্ক নিয়েছেন।

করাচীতে বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক মজার কাণ্ড হয়েছিল। হঠাৎ একদল লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এমন ভাবে D. D. T. স্প্রে করতে সুরু করল যে, যাত্রীরা দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি!

ইউরোপীয় আর আমেরিকান যাত্রীরা ত' চটে-মটেই লাল! এতজন আমেরিকান চীৎকার করে বল্লেন, "What do they mean by this! As if we have come to spread cholera jerms here!"

কিন্তু কার কথা কে শোনে! ফেজ মাথায় লোকগুলো তাদের কাজ শেষ করে নীচে নেমে গেল!

এখানে পাসপোর্ট দেখানোর এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষারও খুব

কড়াকড়ি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একে একে গিয়ে হেল্থ অফিসারের কাছে স্বাস্থ্যের পরীক্ষা দিতে হবে!

আমিও ছিলাম দলের মধ্যে সকলের সঙ্গে। আমার নাম আর ঠিকানা দেখেই হেল্থ অফিসার একেবারে বাঙ্লায় বলে উঠ্লেন, ও! আপনি কল্কাতা থেকে এসেছেন? আচ্ছা, যান —যান! তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন, আর কোনো কিছু প্রশ্ন করলেন না।

বুঝ্লাম, তিনি বাঙালী মুসলমান! দূর দেশ থেকে এসে এই প্রথম বাঙ্লা শুনে এত ভালো লাগ্লো যে কী বলব! ভদ্রলোককে যে ধন্যবাদ দেবো সে কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেলাম! তাঁর বাঙালী-প্রীতি দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দুঃখের কথা, ভদ্রলোকের নামটি জিজ্ঞেস করতে পারিনি তাড়াতাড়িতে। তখনো আমার পিছনে বহু যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের হেলথ্ সার্টিফিকেট দেখাবার জন্যে।

সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে গেলে পর আমরা কে, এল, এম এর বাসে চেপে করাচীর "বিশ্রাম-ভবনে" গিয়ে উপস্থিত হলাম।

রাত্রি তখন গভীর।

তবু নানাবিধ ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল।

আমি আমার প্রিয় পানীয় কমলা লেবুর রস চেয়ে নিলাম।

সুদূর প্রাচ্যে যাবেন এমন কয়েকজন যাত্রী ক্রমাগত মদ্য পান করতে লাগ্লেন। কে, এল, এম থেকে যে পরিমাণ সুরা সরবরাহ করল তাতে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ হল না বলে নিজেদের মণিব্যাগ খুলে নতুন বোতল আনবার হুকুম দিলেন।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা মদ্যপান করলে কথা-বার্ত্তায় অত্যন্ত দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে এক ব্যবসায়ী

ভদ্রলোক ঠিক সেই রকম মানুষ। সবাইকে নিয়ে মস্‌গুল হয়ে বসে গল্প সুরু করলেন। তিনি তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনে কি ভাবে সারা পৃথিবীময় টহল দিয়ে বেড়ান তারই কাহিনী সালঙ্কারে বল্‌তে লাগ্‌লেন। নিয়ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, রোম, জাকার্তা, টোকিও···সব যায়গা নাকি তার কাছে ডাল-ভাত ! আমাদের কাছে শ্যামবাজার, ধর্ম্মতলা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ যেমন অনেকটা তাই। প্রচুর টাকা রোজগার করেন, তাই ছুনিয়ার সেরা সহরগুলি যেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। প্রত্যেক অঞ্চলেই নাকি তাঁদের অফিস আছে। আমি ভদ্রলোকের গল্প শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। রূপোর চাক্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন ভদ্রলোক। ধূলি মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়ে ফিরে আসে। সিদ্ধিদাতা গণেশের অতি প্রিয় পাত্র বলেই মনে হল।

যাই হোক, শেষ রাত্তিরে আহ্বান এলো আবার বিমানে চাপ্‌তে হবে। আমরা একেবারে নিশাচর হয়ে গেছি! কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে! বিমানের মধ্যে শুয়ে থাক্‌বার ত' নিয়ম নেই। কোনো ঘাঁটিতে পৌঁছুলেই সবাইকে নীচে চলে আস্‌তে হবে, পাসপোর্ট দেখাতে হবে। সেই অবসরে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াররা যন্ত্র-দানবটাকে আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখে। দূরের পাল্লার বিমানগুলির আইন-কানুন অতি কড়া। সেইজন্যে এদের ছুর্ঘটনা খুব কম হয়।

আবার বাসে করে বিমান ঘাঁটি, সেখানে দল বেঁধে বিমানারোহণ। সবাই ঢুলু ঢুলু···কেউ ঘুমে, কেউ অতিরিক্ত সুরাপানে।

লাল সাবধানী-বাণী ঘোষণা করে বিমান উড়ল আকাশে। এবার অনেক ওপরে উঠে গেল এই পুষ্পক রথ !

আমাদের খুব শীত করতে লাগ্‌ল।

তখন বিমান-বালিকা এসে সবাইকে কম্বলে ঢেকে দিয়ে মাথার ওপরকার আলো নিভিয়ে দিলে। শুধু পায়ের কাছে মাঝ পথের মৃদু আলো জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জান্‌তেও পারিনি।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌ল সূর্য্যিমামার সোনালী আলোয় সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।

বিমানে ঘোষণা শোনা গেল সকাল ৯টায় বিমান দমদমে পৌছুবে। যারা দমদমে নাম্‌বেন তৈরী হয়ে নিন্‌। আকাশ পরিষ্কার, আবহাওয়া সুন্দর।

মনে মনে ভয় হল, বাগদাদে বৃষ্টির ঘোষণা হয়েও বৃষ্টির দেখা পাইনি। কিন্তু এখানে আবহাওয়া সুন্দর বলে ঝড়ের মুখে ফেলে দেবে না ত? ছেলে বেলায় সেই রাক্ষসের গল্প শুন্‌তাম। বন্দী রাজকুমারীকে যে দিন বলে যেত, আজ খুব দূরে যাচ্ছি, সেদিন থাক্‌ত কাছাকাছি, আবার যে দিন বলত খুব কাছেই থাক্‌বো আজ, সেদিন চলে যেত সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশে।

ইউরোপের একটি চল্‌তি রসিকতা আছে, এক ভদ্রলোক Weather Report শুনে তবে নিজের পোষাক রদ্দুরে দিতেন। যে দিন ঘোষণা থাক্‌তো খুব বৃষ্টি হবে সেইদিন তিনি আলমারী থেকে গরম স্যুট বের করে ছাদে দিতেন।

যাই হোক দেশের কাছাকাছি এসে গেছি।

তাড়াতাড়ি টয়লেটে ঢুকে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে তৈরী হয়ে নিলাম। দমদমে নাম্‌বো আমি আর আমার ইটালিয়ান বন্ধু ট্রয়িয়ানি রেনাটো। বিমান-বালিকা যেন তৈরী হয়েই ছিল। আমাদের আগে ব্রেকফাষ্ট খাইয়ে দিল। এ যেন বাড়ীর ছুটি

লোক বিদেশে যাচ্ছে তাদের খাওয়া-দাওয়ার আগে ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার এক ফাঁকে এসে বিমান-বালিকাটি আমাদের দুজনকে 'প্যারিসের সেন্ট' উপহার দিয়ে গেল। কে, এল, এম এর প্রীতির নিদর্শন। আমরা যেন তাদের প্রীতি ও পরিচর্য্যার কথা এই মিষ্টি সুগন্ধের মতেই মনে রাখি।

আবার সেই লাল আলোর সাবধান-বাণী, কোমরে বেল্ট, বাঁধা আর Chewing gum এর ব্যবহার।

নিজের দেশ।

ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলাম। ১লা বৈশাখ রওনা হয়েছিলাম বলে অনেকে অগস্ত্য-যাত্রার ভয় দেখিয়ে ছিলেন। ফাঁড়া কাটিয়ে আবার ফিরে আসা গেল!

বিমান থেকে অবতরণ করে দেখি কে, এল, এম কর্ম্মী মিঃ সেন স্মিত হাস্যে নীচে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর সাহায্যে কাষ্টম-বৈতরণী পার হওয়া গেল। যে ভদ্রলোক কাষ্টমের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ছিলেন তিনি আমার নামটা জানতেন। তাই বিব্রত না করে একেবারে ছেড়ে দিলেন।

ট্রিয়িয়ানি রেনাটো অনুরোধ করলেন, তিনি যাতে পাকিস্তানের বিমানে চেপে চট্টগ্রাম রওনা হতে পারেন সে ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে। আমি মিঃ সেনকে সেই অনুরোধ পৌঁছে দিলাম। তিনি আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হলেন।

সেদিন কে, এল, এম বাসে কল্‌কাতা গামী আর কোনো যাত্রী ছিল না। মিঃ সেন আমাকে সেই বাসে চাপিয়ে দিলেন। এর ড্রাইভারটি খুব আমুদে আর গল্পী লোক। জানালে, গতকাল রাত্তিরে কল্‌কাতায় দারুণ বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথ ঘাট নাকি

একেবারে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। আমরা রাত্রে বিমানে বসে কোনো আভাসই কিন্তু পাই নি!

ড্রাইভার ভদ্রলোক আমাকে একেবারে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যেতে রাজি হলেন। পাড়ার মধ্যে বাস ঢুক্‌তেই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা। আমাদের মা লক্ষী। উত্তরা-শ্রী সিনেমার সর্ব্বজনপ্রিয় হারুদার মেয়ে।

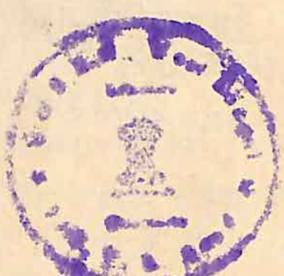
সে আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই সারা পাড়ায় চীৎকার করে জানিয়ে দিলে, কাকাবাবু এসে গেছেন—

প্রথমে কথাটা কেউ বিশ্বাসই করে নি! কৌতূহলীদের ভীড় জমে গেল বাতায়নে-বাতায়নে।

যাবার দিন যাঁরা শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন আজও তাঁরা আমায় সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

বিমান-বাস থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে রবীন্দ্রনাথের সেই কটি লাইন মনে পড়ল—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই"



সাত সমুদ্দুর
তের নদীর পা

